তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

নাভানা

প্রথম সংস্করণ
আষাঢ়—১৩৯৩
জুলাই—১৯৮৬

প্রকাশক
কুনাল কুমার রায়
নাভানা
পি ১০৩ প্রিন্সেপ স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০০৭২

পরিবেশক :
এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট্ লিমিটেড
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩

মুদ্রাকর :
শ্যামসুন্দর ঘোষ
নিউ মা-কালী প্রিন্টার্স
১২/১ রাম চাঁদ ঘোষ লেন
কলকাতা ৭০০০০৬

প্রচ্ছদ :
জয়ন্ত ঘোষ

শ্রীমান ইন্দুভূষণ রায়

স্নেহাস্পদেষু

প্রাক্ কথন

প্রযাত গবেষক ও লেখক তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, ১৮৯৬ সালে ৩ ফেব্রুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীমোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র এবং রাজা রামমোহন রায়ের প্র-পৌত্র, তপনমোহন প্রেসিডেন্সী কলেজের কৃতী ছাত্র ছিলেন। কর্মজীবনে বিশিষ্ট ব্যবহারজীবি হিসাবে সুনাম অর্জন করলেও গবেষণা ও ইতিহাসভিত্তিক লেখার দিকে শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের মানসিকতার ব্যাপ্তি আমরা দেখতে পাই।

দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে "পলাশীর যুদ্ধ" প্রকাশিত হবার সময়েই তিনি প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। এবং নাভানা থেকে আমরা তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করি, পরবর্তী সময়ে "স্মৃতিরঙ্গ", "পলাশীর পর বক্সার", গ্রন্থগুলি প্রকাশ করেছিলাম। বর্তমান গ্রন্থ "মানদণ্ড ছেড়ে রাজদণ্ড", আশা করবো পাঠকদের ভালো লাগবে।

৭ জুন ১৯৮৬

পল্লব মিত্র

নাভানার পক্ষে

এক

১৭৭২ সাল।

দিল্লির বাদশার কাছ থেকে ইস্টইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি-সনদ পাবার পর সাত বছর পার হয়ে গেছে। কিন্তু তখনো ইংরেজরা বণিকের ছদ্মবেশ ত্যাগ করেন নি। বণিকের মানদণ্ড হাতে নিয়েই বাইরে বাইরে ঘুরছেন, রাজদণ্ড ধারণ করে সভায় প্রবেশ করেন নি। লর্ড ক্লাইভ বাংলাদেশের উপর দ্বিতীয়বার কর্তাত্বি করে দেশে ফিরে গেছেন। তাঁর প্রবর্তিত দোআঁশলা বিধানকে, অর্থাৎ বিলিতি তদারকিতে দিশি শাসনপদ্ধতিকে, ঠেকা দিয়ে রেখে, হেন্‌রী ভেরেল্‌স্ট আর জন কার্টিয়ার দুজনে মিলে পাঁচ বছর গভর্নরি করে কোনোক্রমে তাকে চাগিয়ে রাখলেন। তারপর ভেরেল্‌স্টও গেলেন, কার্টিয়ার যাব-যাব করছেন। বাংলার মসনদ থেকে দুটি নবাব—মীর জাফরের দুই ছেলে, নজমউদ্দৌলা আর সৈফুদ্দৌলা—মহাপ্রস্থান করেছেন। তখন সেখানে বসেছেন নবাব মোবারক-উদ্দৌলা, মীর জাফরের আর এক ছেলে বার বছরের এক নাবালক।

বক্‌সারের যুদ্ধের একটু পরেই দেওয়ানি পাবার ফলে দেশের রাজস্ব আদায়ের ভার ইংরেজদের হাতে গিয়ে পড়ে। দেশ বলতে তখন বাংলা বিহার। উড়িষ্যা তখনো মারাঠাদের হাতে। বর্গীর হাঙ্গামার পর সন্ধি করে নবাব আলীবর্দী খাঁ উড়িষ্যাপ্রদেশ তাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। মেদ্‌নিপুর জেলাটা অবশ্য তার থেকে বার করে নিয়ে সেটাকে বঙ্গদেশের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন। সে সময় বর্তমান হুগলি জেলার দক্ষিণ অঞ্চলের কিয়দংশ মেদ্‌নিপুরেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর পর সরকারী কাগজপত্রে মেদ্‌নিপুর জেলাটিকেই উড়িষ্যা বলে উল্লেখ করে সরকার বোধহয় মনে মনে তৃপ্তি পেতেন।

সত্যিকার উড়িষ্যাকে কটক বলে চালানো হ'ত। আমাদের দু'-এক পুরুষ আগেও মেদ্‌নিপুরবাসীদের খাস বাঙালীরা 'উড়িয়া' বলেই ডাকতেন। তাঁদের চুলকাটার ছাঁট্ ওড়িয়া ধাঁচের হত বলে তাঁদের সহজেই আলাদা করে চিনে নেওয়া যেত।

দেওয়ানির সমস্ত কাজকর্মের ভার ক্লাইভ দিশি লোকদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু তদারকির নাম করে আসল ক্ষমতা রেখে দিয়েছিলেন নবাব-দরবারে ইংরেজ রেসিডেণ্টের হাতে। বাইরের থেকে দেখলেই মনে হ'ত যেন সেই পুরনো নবাবী আমলই চলেছে। কিন্তু সবার উপরে বসে ইংরেজ কর্মচারীরা অদৃশ্যে এমনই কলকাঠি টিপতে থাকতেন যে তার ফল হ'ল যে কোনো পক্ষই কাজের দায়ঝুঁকি আর নিজের মাথায় নিতে চাইতেন না। ঐরকম অবস্থাটা যে ভালো করে রাজ্যশাসনের পক্ষে আদবেই অনুকূল নয় সেটা এক কোম্পানীর ডিরেক্টররা ছাড়া আর কারো বুঝতে একটুও কষ্ট হ'ত না।

যতদিন ক্লাইভ গভর্নর ছিলেন ততদিন তাঁর দাপটে সব-কিছু একরকম মানিয়ে যাচ্ছিল বটে, কিন্তু বাড়ি ফেরার জন্যে তিনি জাহাজে চড়বামাত্রই বাইরের সমস্ত চিকনচাকন খসে গিয়ে চোখের সামনেই ভিতরকার খড়ের গাদন বেরিয়ে পড়ল। ক্লাইভের সময়েই ইংরেজ কোম্পানীর তরফ থেকে দেওয়ানির কাজ চালাবার জন্যে মহম্মদ রেজা খাঁ বলে এক খানদানী মুসলমানকে নায়েব-দেওয়ান নিযুক্ত করা হয়েছিল। পরে ইংরেজদেরই তাড়নায় নবাব নজমউ-দ্দৌলা অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকেই আবার নায়েব-নাজিম অর্থাৎ ছোট্টো নবাবও করে দিলেন। নিজে তিনি নিশ্চিন্ত হয়ে রঙ্গরসে গা ঢেলে দিলেন। ঠিক ঐরকমভাবে রাজা সিতাব রায় বিহার-প্রদেশের নায়েব-দেওয়ান আর নায়েব-নাজিম হলেন। নবাববাহাদুর এক জবর কাঠের পুতুল ব'নে গিয়ে প্রজাদের পুতলোবাজি দেখাতে লাগলেন।

সিতাব রায়ের সরকারী কাজের দোষ ধরার মতো তেমন-কিছু

ছিল না। কিন্তু মহম্মদ রেজা খাঁ ঐ ডামাডোলের বাজারে যা পার তা এই বেলা করে নাও—এই নীতি অনুসরণ করে চলেছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ফলে, তাঁর হাতে পড়ে প্রজাদের দুঃখের উপর দুঃখ, ক্লেশের উপর ক্লেশ, দুর্গতির উপর চরম দুর্গতি। কে তাদের ঐ বিষম সংকট থেকে উদ্ধার করে? যিনিই রক্ষক তিনিই ভক্ষক হলে আর উপায় কি? মহম্মদ রেজা খাঁ নিজেই যখন বিচারক তখন তাঁরই কাছে তাঁরই বিরুদ্ধে নালিশ করার আর্জি দাখিল কারই-বা সাহসে কুলোয়? তিনিই যখন সর্বেসর্বা তখন তাঁর বিরুদ্ধে গিয়ে কে নিস্তার পাবে?

তবে সুযোগ বুঝে মহারাজা নন্দকুমার রায় মহম্মদ রেজখাঁ ার উপর সত্যিমিথ্যে নানারকম দোষারোপ করে বিলেতে তাঁর জানা-শোনা সাহেবসুবোদের কাছে এক এক করে বিস্তর চিঠি ছেড়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু সেটা দেশের লোকের উপর মমতাবশত তাদের হিতার্থে, একথা কেউ যেন ভুলেও মনে করে না বসেন। দেশ, দেশের লোক, দেশের মাঁটি—এসব আজকালকার বক্তৃতার কথা। সেকালের লোকেরা ওসবের কোনো ধারই ধারত না। নন্দ-কুমারের চেষ্টা স্রেফ স্বার্থপ্রণোদিত। নজমউদ্দৌলা যখন নবাব হন তখন নন্দকুমার নিজে নায়েব-দেওয়ান নায়েব-নাজিম হবার জন্যে বহু তেলখড় পুড়িয়েছিলেন। সাহেবদেরও অনেককে মুরুব্বি পাকড়েছিলেন। কিন্তু ইংরেজরা তাঁর গোলমেলে স্বভাবের জন্যে তাঁর কথায় কান দেন নি। আর, কি করে যে উপরওয়ালাদের হাতে রাখতে হয় তার কলাকৌশল রেজা খাঁর নখদর্পণে, তাঁর হাতে টাকারও শেষ নেই।

মহম্মদ রেজা খাঁ ঐ দুই পদই অধিকার করে বসায় নন্দকুমার সেই থেকেই তাঁর জাত-শত্রু। কি করে যে তাঁকে তাঁর পদ থেকে হটাবেন তারই ফিকিরে অনবরত ঘুরছেন। মনে প্রচণ্ড আশা, রেজা খাঁ একবার বিদায় হলেই তাঁর শূন্য আসন তিনি নিজেই দখল করে

বসবেন। তা শুধু নন্দকুমার কেন? নিজেদের কারচুপিগুলো ঢাকা দেবার মতলবে কোম্পানীর কতক কতক নামজাদা ইংরেজ কর্মচারীও বাংলাদেশের যাবতীয় দুর্গতির জন্যে রেজা খাঁকে দায়ী করে ডিরেক্টরদের কানভারী করতে লেগে গিয়েছিলেন। ফলে, ডিরেক্টররা ভাবতে শুরু করে দিয়েছিলেন, মহম্মদ রেজা খাঁ-ই বুঝি যত অনিষ্টের মূল। ক্লাইভের বিচিত্র শাসনপদ্ধতি যে তার জন্যে কতটা দায়ী সেটা তাঁরা তখনো তেমন হৃদয়ঙ্গম করে উঠতে পারেন নি। কিন্তু তাঁরাও খানিকটা চোখ বুজেই পড়ে রইলেন। কিছু করতে যাওয়ায় অনেক ফ্যাসাদ। সুতরাং প্রজারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে গেল।

কারণ যাই হোক না কেন অবশেষে বাংলাদেশের হাল এমনই হয়ে দাঁড়াল যে রাজস্ব আর আদায় হতে চায় না। কারো ঘরে তো একটা টাকাও মজুত নেই। যা ছিল তা সবই নায়েব দেওয়ান ক'বছর ধরে দেঁড়েমুষে বার করে নিয়ে গেছেন সরকারী খাজনা বাবদ। আগে তো কোম্পানীকে খুশি রাখতে হবে, নচেত চাকরি থাকে কি করে? তাতে দেশ উচ্ছন্নে যায় যাক। আপনি বাঁচলে ঢের দেশ হবে। ওদিকে মাঠেও চাষ নেই। উপরি উপরি তিন বছর অনাবৃষ্টি অল্পবৃষ্টি গেছে। খরায় খরায় জমি সব ফেটে চৌচির। কাজ কারবারও বন্ধ। যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও যেতে লাগল ইংরেজ কর্মচারীদের পেট ভরাতে। কারণ তখন স্বয়ং গভর্নর থেকে সামান্য কেরানী পর্যন্ত সব সাহেবই রাজকর্মে উদাসীন হয়ে বণিকবৃত্তিই অবলম্বন করে চলেছেন।

'কালা আদমিদে'র দশা চরমে উঠল। কথাটা আমার বানানো নয়, মহাত্মা ক্লাইভেরই সৃষ্টি। তিনি বরাবরই এতদ্দেশীয়দের ঐ অভদ্র ভাষায় উল্লেখ করে গেছেন। যদিচ তাঁর যা-কিছু সম্ভ্রম-প্রতিপত্তি, হাঁকডাক, দাপট-চাপট সে সবই ঐ কালা আদমিদেরই পকেট মেরে। তবে একথা বলতে হয় যে, ক্লাইভ যখন বঙ্গদেশে দ্বিতীয়বার

গভর্নর হয়ে আসেন তখন তাঁর পেট বেশ ভরা থাকায় তিনি তাঁর অধীনে সাহেব কর্মচারীদের পেট-পোরাবার পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মতো জাঁদরেল লোকও বহু চেষ্টা করেও তাঁদের দমন করে উঠতে পারেন নি। মানুষের রাতারাতি ধনী হয়ে ওঠার দুর্নিবার লোভ কি অত সহজেই নিবারণ করতে পারা যায়?

তাই ক্লাইভ স্বদেশে ফিরে যেতে-না-যেতেই সাহেবকুলের সেই প্রচণ্ড লোভ দ্বিগুণ বেগে আত্মপ্রকাশ করে বসল। সেটা বোধহয় খানিকটা বাধা পাওয়ারই দরুন হবে। মোট কথা ওয়ারেন হেস্-টিংস বাংলার গভর্নর হয়ে এসে দেশের অবস্থা যা স্বচক্ষে দেখে-ছিলেন, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন যে ঐ সময়কার অবস্থাকে একমাত্র প্রলয়কালীন অবস্থারই সঙ্গে তুলনা করতে পারা যায়, অন্য আর-কোনো তুলনা নেই। উক্তিটা আদবেই অত্যুক্তি নয়।

অবশেষে ১৭৭০ সালে (বাংলা ১১৭৬ সনে) ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, যা আজকের দিনেও আমাদের অন্তরে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়। দুর্ভি-ক্ষের সঙ্গে বাংলার ঘরেঘরে দারুণ বসন্তরোগ মহামারীরূপে আবি-র্ভূত হ'ল। শেষে দেশের এক-তৃতীয়াংশ (কারো মতে তার অর্ধেক) লোককে যমালয়ে পাঠিয়ে দেশের দুর্গতির ভার খানিকটা লাঘব করে দিয়ে তবে সে ক্ষান্ত হল। স্বয়ং নবাব সৈফুদ্দৌলা সাহেবও ঐ রোগে কালপ্রাপ্ত হন। কিন্তু ক্ষান্ত হলেন না মহম্মদ রেজা খাঁ। তাঁর খাজনা আদায় একদিনের তরেও কমতি যায় নি। দেখা গেল, প্রজারা অনাহারে, অসুখবিসুখে, ঘোর অশান্তিতে পড়ে দিন দিন যতই হাড্ডিসার হয়ে চলছে, নায়েব-দেওয়ান আর তাঁর কর্মচারীরা ঠিক সেই পরিমাণেই নাদুসনুদুস হয়ে উঠছেন।

ইতিমধ্যে দক্ষিণদেশে মারাঠারা আবার উঠে পড়েছে। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে কাবুলী আহম্মদ শা আবদালীর হাতে হাড়ভাঙা মার খেয়ে তারা এতদিন ধরে নিজেদেরই কোটে নেতিয়ে

পড়েছিল। দশ বছর পর আবার চাঙ্গা হয়ে উঠে তারা দক্ষিণ থেকে উত্তরাপথে পা বাড়িয়ে দিয়েছে। বাড়তে বাড়তে শেষে ১৭৭১ সালে দিল্লি পৌঁছে একেবারে লালকেল্লা দখল করে বসে গেছে।

ওদিকে ইংরেজদের আশ্রয়ে এলাহাবাদে বসে বসে দিল্লির বাদশা শা আলম দিন গুনছেন, কবে তিনি আবার তাঁর পিতৃ-পিতামহের স্থানে গিয়ে দিল্লির তখ্‌ত-ই তাউসে চড়ে বসবেন। ইংরেজদের বলে বলে তো তিনি হয়রান হয়ে গেছেন, তাঁরা তো তাঁর কথায় একেবারে গা দেন না। বাদশা তাঁদের হাতের মুঠোয় থাকায় ইংরেজদের প্রেস্‌টিজ বেড়ে গিয়ে পর্বতপ্রমাণ হয়েছে। তাঁরা কেন বাদশাকে অত সহজে হাতছাড়া করতে যাবেন ? তাঁরা জানতেন, হিন্দুস্থানে শক্তিধর যাঁরা, তাঁরাই প্রথমে হিন্দুস্থানের বাদশাকে নিজেদের দলে টানবেন। তাহলেই তাঁরা হিন্দুস্থানে সর্বপ্রধান হয়ে অন্য সবাইকার উপর সর্দারি করতে থাকবেন। তাঁরা ইংরেজদেরও একসময়-না-একসময় এদেশ থেকে তাড়াবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকবেন। সুতরাং বাদশার কথায় ইংরেজদের যে উৎসাহ দেখা দেবে না, সেটা তো ধরা কথা।

হিন্দুস্থানের উজির, অযোধ্যার নবাব, সুজাউদ্দৌলা বাহাদুর ছাড়া শা আলমের অন্যান্য পাত্র-মিত্র, আমীর-ওমরাও, দলবল সবাই তাঁকে দিল্লিযাত্রা থেকে নিরস্ত করার চেষ্টা করতে লাগলেন। এলাহাবাদে তাঁরা তো বেশ সুখেই আছেন। সুবে বাংলার রাজস্ব বাবদ ইংরেজ কোম্পানীর কাছ থেকে সাল সাল ছাব্বিশ লাখ টাকা ঠিক চলে আসছে। বঙ্গদেশের দুর্দশার দরুন আপাতত কিছুদিন সে-টাকা আসা বন্ধ থাকলেও আবার ঠিক আসবে। তার উপর ইংরেজরা সুজাউদ্দৌলার সুবাদারি থেকে কোরা আর এলাহাবাদ দুটো জেলা বের করে নিয়ে তাদেরকে বাদশাহী জাইগির করে দিয়েছেন। তার দরুনও বছর বছর আরো প্রায় আটাশ লাখ পকেটে আসছে। ঐসব ধ্রুব বস্তু ছেড়ে দিল্লির

লাড্ডুর মতো অমন অধ্রুব পদার্থের পিছন পিছন ছোটাছুটি করাটাকে তাঁরা কেউই বুদ্ধি বিবেচনার কাজ বলে মনে করলেন না।

কিন্তু বাদশার মন সব সময়েই সেই দিল্লিরই উপর পড়ে আছে। প্রায় পনের বছর ধরে তিনি পরবাসী। আজ এখানে কাল ওখানে দৌড়ধাপ করে বেড়িয়েছেন। দিল্লিতে গিয়ে থিতিয়ে বসার জন্যে তাঁর মন কেমন করাটা আদবেই বিচিত্র নয়। তাছাড়া শা আলমের প্রকৃতিই ছিল কোনো সদ্‌যুক্তিতে কর্ণপাত না করা। তিনি চারদিক চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলেন হিন্দুস্থানে কে এমন আছেন যাঁর হাত ধরে তিনি নিজের রাজধানীতে গিয়ে উঠতে পারেন। অনেকেই একে একে বাজিয়ে দেখলেন, কিন্তু কাউকেই তেমন পছন্দ হল না। অবশেষে দক্ষিণী মারাঠাদের উপরই তাঁর নজর পড়ে গেল।

চল্লিশ লাখ টাকা মজুরির বদলে মারাঠারা বাদশাহকে দিল্লির মসনদে প্রতিষ্ঠিত করে দেবে বলে কড়ার করে ফেলল। কোনো বাধা না মেনে তিনি দিল্লি যাবার উদ্দেশ্যে একদিন পথে বেরিয়ে পড়লেন। চলতে চলতে মাঝপথে এক জায়গায় বর্ষাকালটা কাটাবার জন্যে ক্যাম্প পেতে বসলেন। বর্ষা কেটে গেলে মারাঠা সর্দার মহাদাজী সিন্ধিয়া আর দিল্লি থেকে বাদশার পারিষদবর্গ সেখানে গিয়ে দেখা দিলেন। আবার যাত্রা শুরু হল। উজির বাহাদুর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ইংরেজ জেনারল সার রবার্ট বার্‌কার বিষণ্ণ মনে বাদশাকে খানিক দূর এগিয়ে দিয়ে এলেন। ১৭৭২ সালের একেবারে গোড়াতেই ইদ্‌পর্বের ঠিক আগের দিনে হিন্দুস্থানের বাদশা শা আলম শানি বাহাদুর দীর্ঘ কাল বিদেশ-বিভুঁয়ে দিন কাটিয়ে অবশেষে দিল্লি দরওয়াজা দিয়ে পিতৃপুরুষদের লাল কেল্লায় ঢুকলেন। সারা শহর জুড়ে উৎসবের ফোয়ারা ছুটল।

ঐ সময় দাক্ষিণাত্যে আরো একজন নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত

করবার চেষ্টায় ফিরছিলেন। তিনি হলেন মহীশূরের হায়দর আলী। খুব নিচু অবস্থা থেকেই তিনি তখন অনেকটা উঁচুতে উঠেছেন। ১৭৭১ সালে তাঁকে দমাবার জন্যে মারাঠারা যখন তাঁর রাজত্ব আক্রমণ করেছিলেন তখন তিনি বার বার ইংরেজদের কাছ থেকে সাহায্য প্রার্থনা করে নিরাশ হন। সেই থেকে তিনিও ইংরেজদের ঘোর শত্রু হয়ে রইলেন। তাই পরবর্তী-কালে বাইরের শত্রুদের হাত থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্ত দক্ষিণী রাজ্যগুলোকে একত্র দলবদ্ধ করে মারাঠারা যখন একটা মিত্রসংঘের প্রতিষ্ঠা করেছিল হায়দার আলীও তখন ঐ সংঘভুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনটি ঘরশত্রু আপাতত মিত্র বনে গিয়ে খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। মারাঠারা, হায়দ্রাবাদের নিজাম, হায়দর আলী,—তিনজনে এক হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে গেলেন। তাঁদের সাহায্যার্থে এগিয়ে গেলেন ইংরেজদের চিরশত্রু ফরাসিরা। কোম্পানীর ডিরেক্টররা ছাড়া আর সবাই বুঝতে পারল ভারতবর্ষের উত্তর-দক্ষিণ দু'দিক দিয়েই ইংরেজদের মাথার ওপর ঘোর বিপদ ঘনিয়ে এল।

কিন্তু তখন ভারতবর্ষের সর্বত্রই ঘোর বিশৃঙ্খলা, ঘোর অরাজকতা, ঘোর অন্ধকার। জোর যার মুলুক তার।

দুই

অবশেষে ডিরেক্টরদেরও টনক নড়ল।

বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি পেয়ে প্রথমটা তাঁদের মাথা ঘুরে গিয়েছিল। ভেবে নিয়েছিলেন, এতদিনে বুঝি কোম্পানীর সমস্ত দুঃখদৈন্য, অসুবিধা-অসোয়াস্তির অবসান ঘটল। ঘর থেকে আর মোটা মোটা অঙ্কের টাকা বার করে মাল কিনতে ভারতবর্ষে পাঠাতে হবে না; রাজস্ব যা আসবে তার থেকে সব খরচখরচা বাদ দিয়ে এমন খানিক টাকা উদ্বৃত্ত থাকবে যে তার থেকে সারা বছরের মাল কেনা হয়েও বেশ-কিছু টাকা কোম্পানীর তহবিলে জমা পড়তে থাকবে। ডিরেক্টররা মনের আনন্দে আকাশকুসুম রচনা করতে লেগে গিয়েছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই কোম্পানীর স্টকের দাম হু হু করে বেড়ে গিয়ে একশো পাউণ্ডের উপর চড়ে গেল। স্টকহোল্ডাররা বেশ ভারী গোছের ডিভিডেণ্ড দেবার জন্যে ডিরেক্টরদের পেড়াপিড়ি শুরু করে দিলেন। কোম্পানীর এক-একটা হেঁজিপেঁজি কর্মচারীকেও বঙ্গদেশ থেকে রাঘববোয়াল হয়ে ফিরে আসতে দেখে, আর দেশে ফিরে এসে তাদেরকে লাটলিটের মতো হাবভাবে চলতে-ফিরতে বলতে-কইতে দেখে সবাই ধরে নিয়েছিলেন, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবার নিশ্চয়ই কল্পতরুর সন্ধান পেয়ে গেছেন। সুতরাং কোম্পানীর মালিকেরা, অর্থাৎ স্টক্ হোলডাররা, বেশি করে লভ্যাংশ পাবার জন্যে চিৎকার-ঝামেলা লাগিয়ে দেবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি?

ওদিকে আবার বৃটিশ পার্লামেণ্ট ভাবলেন কি যে, লুঠের মাল একা কোম্পানীরই ভোগে যায় কেন? ইংল্যাণ্ডের রাজা থেকে

করবার করে তাঁর সামান্য প্রজারা পর্যন্ত সবাইকারই তো তাতে আর্জী কিছু ভাগ পাওয়া উচিত। মেয়াদ ফুরলে কোম্পানীকে আর উঠে করে চার্টার দেওয়া হবে না—ভয় দেখিয়ে পারলামেণ্ট তাঁর কম্পানীর তবিল থেকে বৃটিশ রাজভাণ্ডারে সাল সাল চার লাখ কাউণ্ড করে টাকা জমা দেবার ব্যবস্থা করিয়ে নিলেন। গা-সহাবার ইংরে সর্বত্র যেমন হয় এক্ষেত্রেও অমনি কথা রইল, ঐ বন্দোবস্ত বাই দু'বছরের জন্যে। কিন্তু দু'বছর অন্তর অন্তর বাড়াতে বাড়াতে রাকে ১৭৭২ সাল পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কোথায় গেলভেসে চার্টারের গৌরব, সম্পত্তিভোগের অবাধ অধিকার, শর্ত-কড়ারের অপার মহিমা? কানজুড়ানো মনমাতানো ঐসব বুলি-বোলতান? স্বার্থের কাছে কিছুই কিছু-না।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, কোম্পানীর প্রত্যেকটি আশার মুখে ছাই পড়েছে। আশার ছলনে ভুলে কোম্পানী এমনই বেসামাল হয়ে চললেন যে, দুদিনেই দারুণ দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। ঠিক অমনধারা ইতিপূর্বে আর কখনো হয় নি। এদিক ওদিক থেকে ধারকর্জ করেই কোম্পানীকে কাজকর্ম চালাতে হয়, কিন্তু দেনার উপর দেনায় ডুবতে থাকলে ধারই বা আর-কতদিন পাওয়া যায়? মাথার উপর দেনার জগদ্দল পাথর চাপতে কোম্পানী তো মাটিতে নুয়ে শুয়ে পড়বার উপক্রম করলেন। ভয়ে সবাই আঁতকে উঠতে লাগল। রাজা-প্রজা সবাইকারই কত লক্ষ লক্ষ টাকাই না ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্টকে খাটছে? সোনা কিনা শেষে রাংতায় দাঁড়িয়ে যাবে?

তবু সোজা হয়ে একবার উঠে দাঁড়িয়ে বিপদের সম্মুখীন হয়ে ডিরেক্টররা যা হোক একটা কিছু সমাধান চটপট সেরে ফেললেন না। তিনজনের একটা তদন্ত কমিশন বসিয়ে আরামে হাই তুলে ঘুমতে গেলেন। নিশ্চিন্ত রইলেন, ঐ কমিশনই সব দিক তদারক করে তাঁদের বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার একটা রাস্তা বের করে

থেকে
দেবে। ডিরেকটাররা তো নিজেদের গাফিলনি কিছুতেই স্বী
যাবেন না। তাঁরা তো আগের থেকেই স্থির করে নিয়েছেন, স
দোষ তাঁদের কর্মচারীদের। তাঁদের দুর্দশার মূল হচ্ছে ঐ কর্মচারী
দেরই নিছক বদমাইসি। দেখতেই তো পাওয়া যাচ্ছে, কোম্পানী
যতই যা হোক না কেন, তাদের শ্রীবৃদ্ধির তো একটুও কমতি নেই।
কমিশনের রিপোর্টে সেইটেই প্রকাজ হয়ে পড়ুক, যাতে ডিরেক্টর-
দের দিকে কারো দৃষ্টি পড়েও না পড়ে। সেইটেই ছিল তাঁদের
মনোগত বাসনা।

রাম কিন্তু উলটো বুঝে বসলেন। যে জাহাজ কমিশন নিয়ে
বঙ্গোপসাগর পাড়ি মারতে যাচ্ছিল, আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূলে
পৌঁছবার পর থেকেই নার আর-কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না।
ডিরেক্টররা আবার রামনাম জপ করতে বসে গেলেম। কি করে
মহাবিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়? কমিটি কমিশন বসিয়ে আর
তো ধামাচাপা দেওয়া চলে না। অনেক ভেবেচিন্তে তাঁরা স্থির
করলেন, ক্লাইভের ঐ দোআঁশলা ব্যবস্থায় দেওয়ানি আর চলতে
দেওয়া হবে না, এবার থেকে কোম্পানী সত্যিকারই দেওয়ান হবেন।
অর্থাৎ এখন থেকে আর দিশি নায়েব-ডেপুটি নয়, কোম্পানীর
ইংরেজ কর্মচারীরাই দেওয়ানির সমস্ত দায়ঝুঁকি নিজেদের মাথায়
নিয়ে কাজ চালিয়ে যাবেন। এতদিন কোম্পানী শুধু নামেই দেওয়ান
ছিলেন, এবার কাজেও দেওয়ান হয়ে সভা আলো করতে বেরোবেন।

ডিরেক্টররা আসলে কিন্তু দেওয়ানির কাজের ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা
সম্বন্ধে বিন্দু-বিসর্গও অবগত ছিলেন না। সে কি এক-আধ রকমের?
হাজার রকমের। ক্লাইভ সেটা ভালো করেই জানতেন বলে ঝঞ্ঝাট
পোহানোর ভার দিশি লোকদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজে পায়ের
উপর পা চড়িয়ে দিয়ে মোড়লি করার পার্ট নিয়েছিলেন। যাই হোক
কোম্পানীর নতুন সিদ্ধান্ত কাজে পরিণত করার জন্যে তো একজন
চৌকস লোকের দরকার? ডিরেক্টররা চারদিক বেয়েচেয়ে দেখে

শেষে ওয়ারেন হেস্‌টিংসকে বাংলার গভর্নরের পদে নিযুক্ত করে তোয়া পাঠিয়ে দিলেন। ডিরেক্‌টরদের একজন কারো আত্মীয়-জন কি বন্ধু-বান্ধব না হয়েও তেমন কোনো মুরুব্বির জোর না থাকতেও অন্যদের হটিয়ে হেস্টিংস যে কি করে হঠাৎ ঐ রকম এককটা ভারিক্কে গোছের পদ পেয়ে গেলেন, তাই নিয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা আছে। কিন্তু পেয়ে যে গিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধে অবশ্য দ্বিমত নেই। একটা আধটা অঘটন সব সময়েই অমন হাত ফসকে ঘটে যায়।

হেসটিংস তখন মাদ্রাজে। সেখানকার কাউনসিলে গভর্নরের নিচেই তাঁর স্থান। হয়তো ডিরেক্‌টরদের মনে ছিল, উপস্থিত গভর্নর গেলেই হেসটিংস তাঁর চেয়ার দখল করে বসবেন। কিন্তু তার পূর্বেই তাঁর সৌভাগ্যের উদয় হল। মাদ্রাজে বসেই হেসটিংস খবরটা পেয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে কি স্বদেশী আর কি বিদেশী বহু চেনা অল্পচেনা, অচেনা ব্যক্তির কাছ থেকে অভিনন্দনপত্র এসে তার টেবিলের উপর স্তূপাকার হয়ে পড়তে লাগল। সব কটাতেই ইঙ্গিত আছে নিজেদের কি নিজেদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সুখসুবিধার প্রতি গভর্নর সাহেব যেন একটু কৃপাদৃষ্টি রাখেন। গভর্নরি পরোয়ানা হাতে নিয়ে ওয়ারেন হেসটিংস মাদ্রাজের জাহাজ থেকে চাঁদপাল ঘাটে নামলেন। তাঁর পুরনো ব্যানিয়ান কান্তমুদি —এখন পয়সা হওয়ার দরুণ কান্তবাবু—তাঁকে অভ্যর্থনা করার ঠিক ঘাটে হাজির।

হেস্টিংস তখনো নতুন করে আবার সংসার পাতেন নি। তাই তিনি আলাদা একটা বাড়ি না নিয়ে নতুন কাউনসিল হাউসেরই ক-খানা ঘর নিয়ে সেইখানেই গিয়ে উঠলেন। একটিনি গভর্নর জন্ কার্টিয়ার সব গুছিয়ে-গাছিয়ে নেবার জন্যে আরো কিছু-দিন কোলকাতায় রয়ে গেলেন। ১৭৭২ সালের ১৩ই এপ্রিল তারিখে ওয়ারেন হেস্‌টিংস তাঁর হাত থেকে বাংলার গভর্নরি নিজের

হাতে তুলে নিলেন। ময়দানের নতুন ফোর্ট উইলিয়ন কেল্লা থেকে একুশবার তোপ পড়ল।

এখানে পুরনো কাসুন্দিটা একটু ঘাঁটিয়ে নিতে হয়। হেস্টিংস কোম্পানীর পুরনো চাকুরে। গভর্নরি পাবার আগে বঙ্গদেশে তিনি উনিশ-কুড়ি বছর ধরে কোম্পানীর কাজে হাত পাকিয়েছিলেন। ১৭৩২ সালে ইংল্যাণ্ডের এক প্রাচীন জমিদার বংশে তাঁর জন্ম। কিন্তু তাঁর জন্মাবার সময় নানা কারণে হেস্‌টিংস পরিবারের খুবই পড়ন্ত অবস্থা। জমিজিরেত যা-কিছু ছিল তা সব আগেই গেছে। অবশেষে ভদ্রাসনটুকু বিক্রি হয়ে গেল। হেস্‌টিংসের এক জেঠা কাসটমস হাউসে সরকারী চাকরি পাওয়ার দেশ ছেড়ে লণ্ডন-শহরেই বাস করছিলেন। তিনিই বালক ওয়ারেনকে নিজের কাছে আনিয়ে নিয়ে ইস্কুলে ভর্তি করে দিলেন।

ওয়েসটমিনস্‌টর লণ্ডনের এক বিখ্যাত পাবলিক ইস্কুল। হেস্টিংস সেখানে ইওরোপের প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যে, অর্থাৎ গ্রীক-ল্যাটিনে—এক কথায় ক্ল্যাসিক্‌সে, ছ'দিনেই বেশ তোখড় হয়ে উঠে নাম কিনে ফেললেন। এই ক্ল্যাসিকস-এর চর্চার দরুনই বোধহয় হেস্টিংস উত্তরকালে জীবনের ঝড়-ঝাপটা উত্থান-পতন সবই হাসিমুখে প্রশান্তচিত্তে বহন করতে সক্ষম হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সহপাঠিদের মধ্যে অনেকেই পরে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। এক সহপাঠী ইলাইজা ইম্পে তো বঙ্গদেশের প্রথম ইংরেজ চিফ জস্টিস হয়ে এসে এক বিচিত্র খেল দেখিয়ে গিয়েছিলেন। এঁদের সবাইকার উপরে হেস্টিংস ইস্কুলের ফার্স্ট বয় ছিলেন। কিন্তু তাতে তাঁর মাথা ঘুরে যায় নি। পরের কাছে মানুষ হওয়ার দরুণ হেস্টিংস ছেলেবয়স থেকেই নিজের ওজন বুঝে চলতে শিখেছিলেন।

সবই বেশ একরকম চলছিল। কিন্তু হেস্টিংস ষোল বছরে

পা দিতে-না-দিতেই সই ওলোট-পালোট হয়ে গেল। জেঠামশায়ের মৃত্যু হওয়ার হেস্টিংস যে অভিভাবকের হাতে গিয়ে পড়লেন, লেখাপড়া করার চেয়ে দু-পয়সা কিসে আমদানি করতে পারা যায়, তাতেই তাঁর আগ্রহ ছিল ঢের বেশি। ইস্কুলের হেড-মাস্টারের কথায় কর্ণপাত না করে তিনি ওয়ারেন্‌কে ইস্কুল ছাড়িয়ে নিয়ে এক সওদাগরী হৌসে অ্যাপ্রেনটিস হিসেবে ভর্তি করে দিলেন। মনের দুঃখ মনে চেপে রেখে হেস্টিংস হিসেবের খাতার মধ্যে ডুবে রইলেন। অভিভাবক মশায়ের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে কিঞ্চিৎ যোগাযোগ ছিল। তারই জোরে তিনি শিগগিরই হেস্টিংসের জন্যে সামান্য একটা কাজ জুটিয়ে তাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে ভারতগামী এক জাহাজে তুলে দিয়ে নিজে হালকা হয়ে গেলেন।

১৭৫০ সালের গোড়ার দিকে আঠার বছর বয়েসে হেস্টিংস প্রথম বাংলা দেশে পা ফেললেন। তাঁর মাইনে বছরে পাঁচ পাউণ্ড, অর্থাৎ তখনকার দিনের পঞ্চাশ টাকা। অবশ্য তার সঙ্গে খাওয়া-পরা আর হাত-খরচ বাবদ মাস মাস গোটা পঁচিশেক টাকা আরো ছিল। জাহাজ থেকে নেমে হেস্টিংস প্রথম দু-বছর কোলকাতাতেই কেরানীর কাজে বহাল ছিলেন। তারপর কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্যের ধারা-পদ্ধতি ভালো করে শিখে নেবার জন্যে তাঁকে কাশিমবাজারের কুঠিতে বদলি করে পাঠানো হল। সেখানে তিনি এমন চটপট কাজে পোক্ত হয়ে উঠলেন যে, তিন বছরের মধ্যেই তিনি কাশিমবাজার কাউনসিলের একজন মেম্বর হয়ে বসলেন। ঐ সময় তাঁর প্রধান কাজ ছিল বিলেতে পাঠাবার জন্যে মফঃসল ঘুরে ঘুরে মাল সংগ্রহ করা। দিশি ভাষায় খানিকটা রপ্ত ছিলেন বলে ঐ কাজ তিনি ভালোভাবেই করে তুলতেন।

তাই দেখা যাচ্ছে, ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন

কাশিমবাজার কুঠির উপরে হামলা লাগান, হেস্টিংস তখন উত্তরবঙ্গের এক আড়ং-এ বসে সিল্কের থান কিনতে ব্যস্ত। নবাবের আক্রমণের প্রথম ধাক্কার আঁচটা তাঁকে পোহাতে হয় নি। কিন্তু অল্প কিছুদিন পরেই তাঁকে সেখান থেকে ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল। ইংরেজ কুঠি তখন বন্ধ। ডাচ্ কুঠির সর্দার ভেরনেট-সাহেব তাঁর জিম্মাদার হওয়ার তাঁকে আর ফাটকে যেতে হয় নি, কাশিমবাজারের ডাচ্ কুঠিতেই থাকার অনুমতি পেয়ে গিয়েছিলেন। নজরবন্দী থাকলেও কাশিমবাজারের মধ্যে স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করার বাধা ছিল না। ভেরনেট-সাহেব আর তাঁর স্ত্রী হেস্টিংসকে সমাদরে গ্রহণ করে ডাচ্ কুঠিতে তাঁর বসবাসের সুব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

হেস্টিংস তাঁদের দয়ার কথা জীবনে ভোলেন নি। উত্তরকালে ভেরনেট যখন ব্যাটাভিয়ায় গিয়ে হঠাৎ সেখানে মারা যান তখন তাঁর স্ত্রী নিতান্ত অর্থকষ্টে পড়ে কোনোক্রমে সেখান থেকে কোলকাতায় চলে আসতে পেরেছিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস তখন ভারতের বড়োলাট। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি ভেরনেটদের উাকার বিস্মৃত হন নি। মনে করে রেখেছিলেন। মিসেস ভেরনেটের দুরবস্থার কথা জানতে পেরে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজের তবিল থেকে তাঁর জন্যে বছর বছর তিনশো পাউণ্ডের, অর্থাৎ তিন হাজার টাকার পেনসন বরাদ্দ করে দিয়েছিলেন। মিসেস ভের্নেট তাঁর মৃত্যু কাল পর্যন্ত (১৭৯৩ সাল) ঐ টাকা ভোগ করে গেছেন। একবারও তার খেলাপ হয় নি, যদিও শেষদিকে হেস্‌টিংসের নিজেরই এমন দুর্দশা যে তাঁকে কেউ একটা পেন্‌সন দিলে তাঁর মহা উপকার হয়।

গুজব আছে, নবাব-সরকারের নজরবন্দী থাকার কালে কান্তমুদি (পৈতৃক নাম, কৃষ্ণকান্ত পান্তি) নাকি নানাভাবে হেস্টিংসকে সাহায্য করেছিলেন। হতেও পারে। কিন্তু যেটা গুজব

নয়, সেটা হচ্ছে এই যে, কান্ত কি করে যেন হেস্টিংসেরই এক সহকর্মী বন্ধু ফ্রানসিস সাইকসের খাস কারবারের সরকার হয়ে পড়েন। বৈষয়িক ব্যাপারে কান্তমুদির মাথা খুব পরিষ্কার হওয়ায় তিনি প্রভুর আর নিজের জন্যে বিস্তর অর্থ সঞ্চয় করে ফেলতে পেরেছিলেন। সাইকস তো একটা নবাব বনে গিয়ে এদেশে ছেড়ে স্বদেশে ফিরে গিয়েছিলেন। যাবার সময় তিনি কান্তকে হেস্টিংসের হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু হেস্টিংসের টাকা করার দিকে তেমন মন না থাকায়, আর তাঁর নিজস্ব হিসেবপত্রও তেমন ঝকঝকে তকতকে না হওয়ায়, তিনি ওদিকে বিশেষ-কিছু করে উঠতে পারেন নি। কিন্তু কাতর তাতে কোনো অসুবিধা হয় নি, বরং অনেকটা সুবিধাই হয়েছিল।

ডাচদের কৃপায় হেস্টিংস কাশিমবাজার থেকে চুঁচড়োয় পালিয়ে যেতে পেরেছিলেন আর সেখান থেকে গঙ্গা বেয়ে ফলতায়ও চলে যেতে পেরেছিলেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলার কোলকাতা জয়ের পর বাংলা মুল্লুকের সব ইংরেজই একে একে সেখানে গিয়ে জড়ো হয়েছিলেন। ফলতায় থাকতে থাকতেই হেস্‌টিংস হঠাৎ বিবাহ করে বসেন। পাত্রী তাঁর থেকে অনেক বড়ো বয়েসের এক বিধবা। স্বামী কোম্পানীর ফৌজে ক্যাপটেন ছিলেন। অন্ধকূপ হত্যার কাহিনী-রচয়িতা হল্‌ওয়েল-সাহেবের মতে তিনি অন্ধকূপেই প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। সে যাই হোক, স্বামীর মরণান্তে ঐ বিধবাটিও সকলের সঙ্গে ফলতায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাঁর নিতান্ত বিপন্ন অবস্থা দেখে হেস্‌টিংসের মন গলে গিয়েছিল। তিনি তাঁকে সান্তনা দিতে গিয়ে তাঁকে একেবারে আপন করে নিলেন।

মাদ্রাজ থেকে ফলতায় গিয়ে ক্লাইভ যখন কোকাতা উদ্ধারের জন্যে মার্চ শুরু করে দিলেন তখন হেস্‌টিংস গিয়ে তাঁর ফৌজে ভলেন্‌টিয়র হিসেবে নাম লেখালেন। তখন তিনি সবে ক'দিন

মাত্র বিবাহ করেছেন। নতুন বিয়ে-করা স্ত্রীকে ফলতায় রেখে দিয়ে তিনি ফৌজের সঙ্গে মার্চ করে কোলকাতায় চললেন। মাঝপথে বজবজের যুদ্ধে লড়লেনও ভালো। তারপর কি করে কোলকাতা আবার ইংরেজদের হস্তগত হল, কি করে যে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজরা জিতলেন, ক্লাইভ কি করে যে মীর জাফরকে বাংলার মসনদে বসিয়ে নিজে ড্রেকের জায়গায় বাংলার ইংরেজ গভর্নর হয়ে পড়েছিলেন—এসব সকলেরই জানা কথা। পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

ক্লাইভের একটা মস্ত গুণ ছিল প্রকাশ্যে ব্যক্ত না করলেও কার কি কদর সেটা তিনি মনে মনে ভালো করেই বুঝতেন। তবে যাদের মধ্যে কিছু পদার্থ আছে দেখতেন তাদেরকে তিনি নিজের কাছে না রেখে দূরে পাঠিয়ে দিতেন। যাতে না তুলনায় নিজেই খানিকটা খাটো হয়ে পড়েন। হেস্‌টিংসের গুণপনা তিনি এক-আঁচড়েই বেশ বুঝে নিয়েছিলেন। কাশিমবাজারের কুঠি আবার খুলতেই তিনি হেস্‌টিংসকে উইলিয়ম ওয়াট্‌সের নিচেই সেখানকার কাউনসিলের দু'-নম্বরের মেম্বার করে মুর্শিদাবাদ পাঠিয়ে দিলেন।

তিন

আবার সেই কাশিমবাজার।

উইলিয়ম ওয়াট্‌স যদিও নামে সেখানকার কুঠির অধ্যক্ষ, আসলে তিনি নবাব-দরবারের ইংরেজ রেসিডেণ্ট। সুতরাং কুঠির সর্দারি সহজেই ওয়ারেন হেস্‌টিংসের ওপর গিয়ে পড়ল। হেস্‌টিংস পড়ুয়া লোক। মদ খেয়ে আর জুয়া খেলে সময় নষ্ট না করে, কিংবা রাতারাতি ধনী হয়ে ওঠার লোভে পয়সার ফিকিরে ছোটাছুটি না করে, তিনি মন দিয়ে আরবি-ফার্সী শিখতে লাগলেন। নবকৃষ্ণ দেব একসময় তাঁরও ফার্সীর মাস্টার ছিলেন। ফড়ফড় করে ইংরেজী বলে যেতে পারতেন বলে নবকৃষ্ণ তাঁর ইংরেজ ছাত্রদের ফার্সীভাষা একরকম ভাল করেই শিখিয়ে দিতেন। তাঁরই কাছে হেস্টিংসের ফার্সীতে হাতেখড়ি। এখন আবার এক মুসলমান মৌলভী রেখে হেস্টিংস পুরোদমে ঐ দুই ভাষার চর্চা লাগিয়ে দিলেন। কালক্রমে তাতে অনেকটা পোক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তবে তাঁর ফার্সীবিদ্যার খ্যাত যতটা প্রচার হয়েছিল, আসলে তাঁর ফার্সীজ্ঞান ততটা গভীর ছিল কিনা সন্দেহ। অনেকটা উপর উপর মতোই ছিল। কিন্তু তাতেই কাজ চলে যেত।

রেসিডেণ্ট ওয়াট্‌স সাহেব যখন কোলকাতার সন্ধির শর্তগুলো নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে দিইয়ে মানাবার চেষ্টা করেছিলেন হেস্টিংস তখন ফার্সী আউড়ে সবাইকে চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। কার্যোদ্ধারও অনেকটা করতে পেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, দেখা গেল, হেস্টিংস ডিপ্‌লোম্যাসিতেও বেশ চতুর হয়ে উঠছেন। ওয়াট্‌সের সঙ্গে নবাবের বোঝাপড়া হবার সময় হেস্টিংস তাতে যে অংশ গ্রহণ করেছিলেন সেটাকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ভেবে তুচ্ছ

করে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। পলাশীর যুদ্ধের পর উইলিয়ম ওয়াট্‌স কোলকাতার কাউন্‌সিলের মেম্বর হয়ে মুর্শিদাবাদ ছেড়ে চলে গেলেন। তাঁর জায়গায় লুক্‌ স্ক্রাফটন এলেন। তিনি অল্প দিন পরেই চলে যেত ক্লাইভ ওয়ারেন হেস্টিংসকেই ঐ পদে বসিয়ে দিলেন। সেই থেকে একনাগাড়ে সাড়ে তিন বছর ধরে হেস্টিংস নবাব-দরবারে রেসিডেণ্ট হয়ে কাশিমবাজারেই থেকে গিয়েছিলেন।

ক্লাইভ তাঁর মুরুব্বি হলেও হেস্টিংসের স্বভাব ছিল ক্লাইভের একেবারে বিপরীত। ক্লাইভ যে দিশি লোকদের অর্থশোষণের একটা উপকরণ ছাড়া মানুষ বলে বিবেচনা করতেন না, হেস্টিংস তাঁদেরই আপনজনে বলে ভাবতেন, তাঁদের সুখদুঃখ জানবার চেষ্টা করতেন, কি বাক্যে আর কি আচরণে কখনো তাঁদের অাঁতে ঘা দিতেন না। ক্লাইভের মতো তিনি কখনো দিশি লোকদের দিয়েই কার্যোদ্ধার করিয়ে নিয়ে তারপর তাঁদেরকে 'কালা আদমি' আখ্যা দিয়ে মুখ বেঁকিয়ে তফাতে সরে গিয়ে বসতেন না। বাহুবলের দ্বারা লোককে বশ করার চেয়ে সদ্‌ব্যবহারে লোকদের হৃদয় জয় করার দিকে হেস্টিংসের ঢের বেশি ঝোঁক ছিল।

ফলে, এদেশের প্রজা, জমিদার, মহাজন, রাজকর্মচারী সবাই—এমন কি নবাববাহাদুর আর তাঁর সভাসদেরাও হেস্টিংসকে স্নেহ করতেন, বিশ্বাস করতেন, শ্রদ্ধাভক্তিও করতেন; ক্লাইভের মতো শুধু ভয় করেই চলতেন না। ক্লাইভ নিজে হেস্টিংসের ঐ নেটিভপ্রীতি সম্বন্ধে শ্লেষবিদ্রূপ করে তাঁকে বারবার সাবধান করে দিয়ে গেছেন, কিন্তু তাঁকে শুধরে উঠতে পারেন নি। কোম্পানীর অন্যান্য ইংরেজ কর্মচারীরাও প্রায় সবাই ক্লাইভেরই মতাবলম্বী। সুতরাং তাঁরাও হেস্টিংসকে তেমন বুঝে উঠতে পারতেন না। তাই হেস্টিংস যেন একটু খাপছাড়াগোছের হয়ে থাকতেন। সহজেই তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করে চিনে নেওয়া যেত।

হেস্টিংসের ওপর দিশি লোকদেরও অনুরাগের কারণ বুঝতে

না পেরে তখনকার ইংরেজরা তাঁরই উপর অযথা খানিক বিরক্ত হয়ে উঠতেন। নিজেদেরকে উত্যক্ত বোধ করতেন। আসলে খাওয়া পরা সম্বন্ধে আত্মভোলা হেস্টিংসের দিশি লোকেরই মতো উদাসীন ভাব, জীবনযাত্রার ধরনধারনে অদ্ভুত সংযম, তাঁর গভীর ন্যায়-পরায়ণতা, নিরপেক্ষ সুবিচার, উদ্ধতাহীন আত্মমর্যাদাজ্ঞান—এই সবই যে তাঁকে দিশি লোকদের তাঁর প্রতি অনুরক্ত করে তুলেছিল, সে-কথা এই সবে ইংরেজ ঐতিহাসিকরা একটু একটু করে বুঝে উঠতে শুরু করেছেন। আর, ইংরেজ বুঝলেই আমরা বুঝি।

তবে একজন দিশি ব্যক্তিকে হেস্টিংস কিছুতেই বরদাস্ত করে উঠতে পারেন নি। হেস্টিংস খোলাখুলিভাবেই লিখে গেছেন, এক নন্দকুমার ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনো লোকেরই উপর তাঁর ব্যক্তিগত বিদ্বেষ কখনো জমে ওঠে নি। তাঁর নিজস্ব জীবনে নন্দকুমার ছাড়া তাঁর আর কোনো শত্রু ছিল না। উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হয় হেস্টিংস মুর্শিদাবাদ রেসিডেন্ট থাকার সময়েই, আর শেষ হয় নন্দকুমার যখন ফাঁসিকাঠে ঝুলে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়ে ইতিহাসের পাতায় নাম লিখিয়ে রেখে যান।

একটু বেশি বয়েসেই নন্দকুমার ব্রাহ্মণের কুলধর্ম পরিত্যাগ করে দেশ ছেড়ে রাজধানী মুর্শিদাবাদে চলে যান। সেখানে গিয়ে তিনি পশ্চিমা উমিচাঁদকে (আমীরচন্দ) মুরুব্বি পাকড়ে তাঁরই আওতায় বসে অব্রাহ্মণের কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। উমিচাঁদ তখনো কোলকাতাবাসী হন নি। তবে ইংরেজদের সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করা শুরু করে দিয়েছেন। তখনকার দিনের ঐহিক উন্নতিকামী অনেক বুদ্ধিমন্ত বাঙালীর মতো নন্দকুমারও ইংরেজদের দিকে ঝুঁকেছিলেন। বঙ্গদেশে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত করতে অনেক-রকমেই সাহায্য করেছিলেন। এমন কি অন্নদাতা মুসলমান প্রভুদের সঙ্গে বেইমানি করতেও একটুও পেছপা হন নি।

যদিচ নন্দকুমারের মনোভাব শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের অনুকূল

ছিল না, তবু গোড়ায় তিনি তাঁদের সত্যিকারই হিতকামী ছিলেন। বৈষয়িক ব্যাপারে অত্যন্ত কুশলী আর ছলাকলায় অতিরিক্তরকম পারদর্শী হওয়ায় তিনি সহজেই ক্লাইভের সুনজরে পড়ে যান। কালক্রমে তার এক বিশেষ প্রিয়পাত্রও হয়ে ওঠেন। রকম-সকম দেখে ইংরেজরাই তাঁর উপনাম দিয়েছিলেন—দ' ব্ল্যাক্ বর্নেল। নন্দকুমারকে দিইয়ে কাজ হাসিল করার উদ্দেশে ক্লাইভ বাইরের থেকে তার যথেষ্ট খাতির করলেও নিজের বিশ্বস্তদের কাছে তার যে গুণ বর্ণনা করে গেছেন সেটাকে আর যাই হোক, প্রশংসাত্মক বলে তা মোটেই চালাতে পারা যায় না।

মসনদের লোভে মীরজাফর তাঁর সমস্ত টাকাকড়ি ধনরত্ন দামী-দামী জিনিসপত্র সবই ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়েও তাঁদের খাঁই মেটাতে পারলেম না, পাওনার জের বাড়তে বাড়তেপর্বতপ্রমাণ হতে চলল। তখন দেনার দায়ে অস্থির হয়ে তিনি বর্ধমান হুগলী আর নদীয়া জেলার মালগুজারির টাকা কোম্পানীর নামে লিখে দিয়ে খানিকটা পরিত্রাণ পেলেন। মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট হিসেবে সে টাকা আদায়ের ভার পড়ল হেস্টিংসের উপর। কিন্তু ভিতর থেকে কলকাঠি টিপে নন্দকুমার তাঁর ও-ক্ষেত্রের সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ করে দিলেন। আর না পেরে তিনি নন্দকুমারের নামে ক্লাইভের কাছে নালিশ ঠুকে দিলেন।

ওদিকে নন্দকুমারও কিছু চুপ করে বসে রইলেন না। নিজের কেরামতি দেখাবার ঐ সুযোগ ছাড়তে তিনি একটুও উদ্‌গ্রীব নন। তিনি ক্লাইভের কাছে গিয়ে জানলেন, এতদ্দেশী রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত কাজে হেস্টিংস সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আদায়ের ভার কর্নেল-সাহেব তাঁর উপর দিলে তিনি দুদিনে ঠিকঠাক করে দিতে পারেন। ক্লাইভের কার্যোদ্ধার নিয়েই কথা। উপায়ের ভালোমন্দ নিয়ে কোনোদিনই তাঁর মাথাব্যাথা ছিল না। তিনি মালগুজারি আদায়ের কাজে নন্দকুমারকে হেস্টিংসের উপর বসিয়ে দিলেন।

হেস্টিংস নন্দকুমারের বিরুদ্ধে যা যা লিখেছেন তার একটাতেও তিনি কান দিলেন না। উল্‌টে তাই নিয়ে হেস্টিংসকেই তাঁইশ করতে লাগলেন। সেই থেকেই হেস্টিংস নন্দকুমারের উপর বিষম বিরূপ। কালক্রমে নন্দকুমারের আরো অনেকরকমের অপকীর্তি ঐ বিরাগকে বাড়িয়ে তুলে তাকে গভীর বিদ্বেষে পরিণতি করেছিল।

১৭৬০ সালে ক্লাইভ প্রচুর ঐশ্বর্যের মালিক হয়ে দেশে ফিরে যান। কিছু পরেই হেনরী ভ্যান্‌সিটার্ট তাঁর জায়গায় গভর্নর হয়ে এলেন। ওয়ারেন হেস্টিংসকে তাঁর পছন্দ হওয়ায় তিনি তাঁকে নিজের সহকারী করে কোলকাতায় নিয়ে আসেন। কাউনসিলেও তাঁর জন্যে একটা আসন বরাদ্দ করা হল।

ভ্যান্‌সিটার্ট সাদাসিধে ভালোমানুষ লোক। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে যে ভালোমানুষের ঠাঁই নেই সেটা ইতিহাসে অনেক বার প্রমাণ হয়ে গেছে। ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে ভ্যান্‌সিটার্টের দক্ষতা অনেকের চেয়ে বেশি হলেও, বিবেকবুদ্ধিকে সবকিছুর সঙ্গে মানিয়ে-জুলিয়ে না নিতে পারায় তিনি পলিটিক্সে একেবারে অচল হয়ে রইলেন। দেশের মঙ্গলের জন্যে ভাঙখোর মীরজাফরের জায়গায় কাজের মানুষ মীরকাশিমকে নবাবী পদে বসানো, ইংরেজদের স্বার্থের বিরুদ্ধে গেলেও তাঁর শাসনে দেশের হিত হচ্ছে দেখে তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা, নিজের মতো করে নিজের রাজত্ব চালাতে তাঁকে বাধা না দেওয়া, বরং তাতে তাঁর পুরো অধিকার স্বীকার করে নেওয়া—এসব ভ্যান্‌সিটার্টের ন্যায়বুদ্ধির শুভবুদ্ধির পরিচায়ক হতে পারে বটে, কিন্তু পলিটিকল বুদ্ধিবিবেচনার অভাবেরই নিদর্শন।

সুতরাং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, এক হেস্টিংস ছাড়া অন্য সব কাউনসিলারই তাঁর বিরুদ্ধে চলে গেছেন। কারণ তাঁরা পলিটিশিয়ন—তাঁদের কাছে স্বার্থের চেয়ে বড়ো আর-কিছু ছিল

না। তাঁরা মীরকাশিমকে হটিয়ে তাঁদের স্বার্থের অনুকূল মীরজাফরকে আবার গদিতে বসাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত বসিয়েও ছাড়লেন।

হেস্‌টিংসের চরিত্র অনেকটা ভ্যান্‌সিটার্টের মতো হওয়ায়, কাউনসিলে হেস্‌টিংসই তাঁর একমাত্র সহায়ক দাঁড়িয়ে ছিলেন। তবে হেস্‌টিংস ভ্যান্‌সিটার্টের চেয়ে ঢের বেশি কাজের মানুষ। লোক বশ করার ক্ষমতাও ছিল তাঁর অনেক বেশি। তাই তিনি সৎপরামর্শ দিয়ে ভ্যান্‌সিটার্টে অনেক দূর চালিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত অন্যদের সঙ্গে পেরে ওঠেন নি। অন্যদের মূল মন্ত্রই ছিল—চট্‌পট্‌ দু'পয়সা করে নিয়ে দেশে ফিরে চল। দেশের লোক তাতে জাহান্নামে যায় যাক্‌, তাতে কিছুই যায় আসে না।

দিশি লোকদের প্রতি কাউনসিলরদের ব্যবহারের বিবরণ দিতে গিয়ে হেস্‌টিংস বলেছেন, ইওরোপিয়ানদের, বিশেষ নিচু জাতের ইওরোপীয়ানদের, ব্যবহারের এমন এক উগ্রচণ্ডামির ভাব আছে, যেটা কিছুতেই বাঙালীদের শান্ত বিনম্র স্বভাবের সঙ্গে খাপ খেতে চায় না। অবশ্য মনে রাখতে হবে কথাটা দু'শো বছর আগেকার, আজকালকার নয়। সুতরাং প্রেসিডেণ্টের মতো হেস্‌টিংসকেও একঘরে হয়ে থাকতে হল। শুধু তাই নয়। একদিন কাউনসিলে মীরকাশিম সম্বন্ধে তর্ক ওঠায় হেস্‌টিংস যেই তাঁর স্বপক্ষে দু'চার কথা বলতে গেছেন ওম্‌নি স্ট্যান্‌লেক ব্যার্টসন বলে এক অতি বেয়াদব বর্বর কাউনসিলর রাগের চোটে দাঁড়িয়ে উঠে, হেস্‌টিংস আর ভ্যান্‌সিটার্টকে মীরকাশিমের ভাড়াকরা মোক্তার বলে গালাগাল দিয়ে সবার সামনেই হেস্‌টিংসের গালে এক চড় কষিয়ে দিলেন।

বক্‌সারের যুদ্ধ শেষ হবার ঠিক একমাস পরেই নিতাই বিরক্তি-বশেই ভ্যান্‌সিটার্ট কোম্পানীর কাজে ইস্তফা দিয়ে দেশে ফিরে

গেলেন। ঠিক তার পরের মাসেই ওয়ারেন হেস্‌টিংসও কাজ ছেড়ে দিয়ে জাহাজে উঠলেন। শেষ পর্যন্ত নীচ লোকদেরই জয়জয়কার। উপরে উঠে পড়ে তাঁরা বাংলা দেশকে তছনছ করে ছাড়লেন। ন্যায়, ধর্ম, ভদ্রতা ইত্যাদি সবেতেই জলাঞ্জলি পড়ল।

দেশে ফেরবার সময় হেস্‌টিংস হিসেব করে দেখেছিলেন, চোদ্দ বছর কোম্পানীর কাজ করে তাঁর মোট সম্পত্তি দাঁড়িয়েছে তিরিশ হাজার পাউণ্ড, অর্থাৎ তিন লক্ষ টাকার মতো। তাও আবার নগদে নয়, প্রায় সবটাই ব্যবসায় খাটছে। তখনো কোম্পানীর কর্মচারীদের নিজ তবিলে ব্যবসা করাটা একেবারে বন্ধ হয়ে যায় নি। কোম্পানী তাঁদের কর্মচারীদের যে মাইনে দিতেন তাতে অবশ্য কারো পেট ভরত না, উল্‌টে পেট জ্বালা নিবারণের জন্য তাঁদের নানারকমের উপায় অবলম্বন করতে হত। তাদের সব-গুলোকে অবশ্য সদুপায় বলা চলে না, তাঁদের অনেকেই হেস্‌টিংসের চেয়ে ঢের কম দিন চাকরি করে ঢের বেশি টাকা করে নিয়ে দেশে ফিরেছিলেন। তার কারণ, হেস্‌টিংসের কাজ-করবার অন্যদের মতো নোংরা কাণ্ড কিছু ছিল না। আর, অন্যদের মতো উঁচু পদে বসে থেকেও হেস্‌টিংস কখনো কারো কাছ থেকে এক পয়সা ঘুস নেন নি। অবশ্য তখনকার দিনে ঘুসকে ঘুস বলতে অনেকেরই আপত্তি ছিল, যেমন এখন অনেকের কোদালকে কোদাল বলতে আপত্তি দেখা যায়। তাই তাঁরা ঘুসকে ভেট সওগাত উপহার পুরস্কার ইত্যাদি নানা মনোহারী নামে অভিহিত করে মনে মনে তৃপ্তি বোধ করতেন।

হেস্টিংস তখন সম্পূর্ণ একলা। মুর্শিদাবাদে থাকতে থাকতেই তাঁর স্ত্রীর আর শিশুকন্যার মৃত্যু হয়। সাত বছরের ছেলে জর্জ হ্যাম্‌শায়ারে থেকে পড়াশুনো করছিল। জাহাজ থেকে নেমেই হেস্টিংস খবর পেলেন, সেও তার আট মাস আগে ডিপথিরিয়া রোগে মারা গেছে। অতদিন দেশের বাইরে থাকায় হেস্টিংস যেন

আর নিজের দেশকে চিনে উঠতে পারছেন না। আত্মীয়স্বজন, পুরনো বন্ধুবান্ধবদের প্রায় সবাই মৃত। নতুন যে-সমাজ দাঁড়িয়েছে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার মতো টাকা তাঁর হাতে নেই। তাই তিনি অনেকটা ছন্নছাড়া হয়েই দিন কাটাতে লাগলেন। এম্‌নি সময় খবর পেয়ে গেলেন, তাঁর তিরিশ হাজার পাউণ্ডের মধ্যে বিশ হাজার পাউণ্ডই ব্যবসায় ডুবে গেছে। হিসেব নিয়ে দেখা গেল, সব বেচেবুচে নিঃস্ব হয়ে গেলেও তখনো তার দেনা থাকে চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা। শিগগিরই একটা বিহিত না করতে পারলে তাঁকে দেউলের খাতায় নাম লেখাতে হয়।

গুজব আছে, এই সময় নানা কাজের উমেদারিতে হেস্টিংস অনবরত ঘুরপাক খেয়ে বেড়িয়েছিলেন। অসম্ভব কিছু নয়। কিন্তু কোনোটাতেই যে কৃতকার্য হতে পারেন নি, সেটা ধ্রুব সত্য। তাছাড়া হেস্টিংসের মন পড়ে আছে ভারতভূমির উপর। পৈতৃক ভদ্রাসন আর তার লাগাও জমিজমাগুলো উদ্ধার করার এক প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনকে ক্ষণেক্ষণে মোচড় দিচ্ছে। আবার কোম্পানীর চাকরি ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে সে-আকাঙ্ক্ষা মিটতে পারে বলে তো বিশ্বাস হয় না। কিন্তু কোম্পানীর ডিরেক্টরদের কাছে দু'-দু' বার হাত পেতে হেস্টিংস বিফলমনোরথ হলেন। তবে ভাগ্য বোধ হয় সুপ্রসন্ন ছিল। তৃতীয়বারের চেষ্টায় মাদ্রাজের চাকরিটা একরকম দৈবক্রমেই যেন হাতে পেয়ে গেলেন। ধারকর্জ করেই তিনি বিদেশ-যাত্রার সাজসজ্জা ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করলেন।

যে জাহাজে হেস্টিংস মাদ্রাজ যাচ্ছিলেন সেই জাহাজেই ইম্‌-হোফ বলে এক জার্মান পরিবার তাঁর সহযাত্রী ছিলেন। কর্তা কার্ল ফন্‌ ইম্‌হোফ, গৃহিনী আনা মারিয়া আর তিন বছরের এক শিশুপুত্র চার্লস। ইম্‌হোভ নিজেকে ব্যারন বলে পরিচও দিলেও টাকার টানাটানি তাঁর কারো চেয়ে কম ছিল না। তলোয়ার ঘোরানো ছাড়া তাঁর হাত তুলি ধরতেও মজবুত ছিল। হাতির

দাঁতের পাতের উপর লোকদের মিনিয়েচর ছবি এঁকে দিতে তিনি বেশ পটু হয়ে উঠেছিলেন। জার্মান ফৌজের কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি ঐ ছবি আঁকার কাজকে পেশা করে নিয়ে ইংল্যাণ্ডে যান। কিন্তু সেখানে তেমন জমাতে না পেরে এখন ভারতবর্ষে চলেছেন। শুনেছেন সেখানে বহু রাজা-মহারাজা, নবাব-সুবাদার, আমীর-ওমরাও, জমিদার মহাজন। তাদের হাতে টাকার ছড়াছড়ি। দক্ষিণাটাও দেন ভালো।

কর্নেল-সাহেবের রূপবতী গুণবতী ভার্যা। সকলের চোখে পড়ার মতো। কালক্রমে ঐ নারী হেস্টিংসের জীবনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসেছিল। সে-কাহিনী পরে আসছে।

আড়াই বছর মাদ্রাজে কাটিয়ে হেস্টিংস বঙ্গোপসাগর পাড়ি দিলেন। তখন তিনি সবে চল্লিশের কোঠায় পা দিয়েছেন।

চার

সেই পুরনো কোলকাতা।

তবে হেস্‌টিংস এবার আর একটা নগণ্য কেরানী হয়ে নয়—একেবারে সর্বপ্রধান হয়ে কোলকাতায় পদার্পণ করলেন।

সকলেই ভালো করে জানেন, এমন কতকগুলো ব্যাপার আছে যার সম্বন্ধে মুখে উপদেশ দেওয়াটা খুবই সোজা কাজ, কিন্তু সেটাকে কাজে করে তোলাটা আদবেই সহজ কর্ম নয়, অত্যন্তই দুরূহ। ডিকেক্টররা তো লিখে দিয়েই খালাস—কোম্পানী এখন থেকে আর শুধু নামে নয়, কাজেও দেওয়ান হতে চান—কিন্তু তার ধকল পোহায় কে ? আসলে দেওয়ানি জিনিসটা যে ঠিক কি সে-সম্বন্ধে তাঁদের স্পষ্ট কোনো ধারণা ছিল না। তাঁরা ভেবে নিয়েছিলেন, সাহেব কর্মচারীদের হাতে রাজস্ব আদায়ের ভার চাপিয়ে দিলেই বুঝি সব তেলতেলা চাকার মতো স্বচ্ছন্দে ঘুরতে থাকবে। আর কমর্মচারীরা ইংরেজ হলে কারচুপি করলে তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে দেশের ফৌজদারিতে সোপর্দ করে দিলেই সব গণ্ডগোল মিটে যাবে। দিশি কর্মচারীদের সম্বন্ধে সে-ব্যবস্থা তো চলবে না। আসলে কোম্পানিকে দেওয়ানগিরি করতে হলে এ দেশের চলতি শাসনতন্ত্রের যে নলচেখোল বদলাতে হবে, সেটা তাঁদের মাথায় ঢোকে নি।

তবে ডিরেক্টররা বুদ্ধিমান লোক। বেশ কিছু বলতে গেলে পাছে ধরা পড়ে যান, সেই ভয়ে তাঁরা শুধু জানিয়ে দিয়েই নিশ্চিন্ত রইলেন যে, তাঁরা সব-কিছু বেশ ছিমছাম তকতকে দেখতে চান। কাজে কাজে সব-কিছু সাফ-সুতর করার ভার সহজেই গভর্নরের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। তাতে হেস্‌টিংসও ভেবে নিয়েছিলেন,

তিনি এ দেশের উন্নতির দরুনও যা ভালো বোঝেন সেইরকম কাজ করে গেলে ডিরেক্টররা খুশি হবেন। গোড়ায় গোড়ায় তাঁরা হয়েও ছিলেন। হেস্‌টিংসের সব-কিছু সংস্কার কাজে তাঁদের সায় পাওয়া গিয়েছিল। তাতে কাজও ভালো হয়েছিল। কিন্তু উপরওয়ালার কথার উপর নির্ভর করে চললে শেষ পর্যন্ত কি ঠক্বান ঠকতে হয়, সেটা হেস্‌টিংস খানিক পরেই টের পেয়েছিলেন।

হেস্‌টিংস নিজেও বরাবর ক্লাইভের দো-আঁশলা গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে। দিশি লোকদের উপর রাজকার্যের ভার চাপিয়ে দিয়েও তাঁদের হাত থেকে আসল ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে তাঁদেরকে ঠুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে রেখে ছাই ফেলতে ভাঙা কুলোর মতো সব দোষ তাঁদেরই উপর চালাতে হেস্‌টিংসের খুবই আপত্তি ছিল। দিশি লোকদের হেস্‌টিংস খুবই বিশ্বাস করলে তাঁর মতলব ছিল তাঁরা কাজ করবেন ইংরেজদের তাঁবে তাঁদের সঙ্গে মিলেমিশে। কিন্তু যাতে সবাই কোম্পানী বাহাদুরকে তাদের মনিব বলে মেনে চলে, সেইটেই ছিল হেস্‌টিংসের শাসনপদ্ধতির মূলমন্ত্র। দেওয়ানি নিজের হাতে চালানো মানে তিনি তাই বুঝেছিলেন।

ডিরেক্টরদের দৃঢ় বিশ্বাস যে বাংলা দেশের দুর্গতির মূলে আছে তাঁদের কর্মচারীদেরই নষ্টামী। তা সে কর্মচারী কি ধলা আর কি কালা। কিন্তু হেস্‌টিংসের ধারণা অন্যরকমের। যেখানে শাসন-পদ্ধতিই বিকৃত ধরনের সেখানে কর্মীদের দোষ দেখিয়ে কর্মচারী বদলিয়ে যে কোনোই সুরাহা করা যায় না, সেকথা হেস্‌টিংস খুবই মানতেন। তাঁর মতে শাসনব্যবস্থাই উন্নতধরনের হওয়া চাই। হেসটিংস আরো জানতেন, ডিরেক্টররা মুখে যতই আক্ষেপ করে বেড়ান না কেন যে, তাঁদের কর্মচারীরাই তাঁদের ডুবিয়েছেন কিন্তু কাজের বেলায় দেখা যাবে, ঐসব কর্মচারীর কেউ তাঁদের আত্মীয় কুটুম্ব, কেউ তাঁদের পেয়ারের লোকদের আপনজন, কেউ বা তাঁদের পোলিটিকল মুরুব্বিদের আশ্রিত অনুগত ব্যক্তি।

তাঁদের পিছনে লাগতে গেলে তো সর্বাগ্রে তাঁকেই কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হয়। হেস্‌টিংস ও পথে গেলেম না। তবে খাস জায়গাগুলোতে তিনি নিজর বিশ্বস্ত লোকদের বেছে বেছে এনে বসিয়ে দিয়েছিলেন। না দিলে কাজ চলত না। থিওরিস্টরা তাঁর বিরুদ্ধে গলা ছেড়ে যতই চিৎকার করে মরুন না কেন।

গভর্নরের তেরজন মেম্বর নিয়ে যে কাউনসিল ছিল, প্রখর ব্যক্তিত্বের গুণে হেস্‌টিংস তাকে মনের মতো করে চালিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। যদিও মেজরিটির রায় বাতিল করে দেওয়ার কোনো ক্ষমতা গভর্নরের ছিল না, তবু সেদিক দিয়ে হেস্‌টিংস কোনোদিন কোনো বাধা পেয়ে বসেন নি। তবে ক্লাইভের মতো কাউনসিলরদের কাউকে তাড়ানো কাউকে দূরে মফস্বলে সরানো, কারো-বা চাকরিই খেয়ে দেওয়া—এসব কিছুই হেস্‌টিংসকে করতে হয় নি। তাঁদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে, তাঁদের সুখ-দুঃখের উপর দৃষ্টি রেখে, যুক্তি দিয়ে তাঁদেরকে সব বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাঁদের আপনজন করেই হেস্‌টিংস অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হতে পেরেছিলেন।

গভর্নরের গদিতে বসবার ঠিক দশদিন পরে ডিরেক্টরদের সিক্রেট কমিটির কাছ থেকে এক গোপনীয় নির্দেশপত্র হেস্‌টিংসের হাতে এসে পৌছল। কমিটি জানিয়েছেন, নায়েব-দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁ আর তাঁর ম্যানেজার অমৃত সিংহকে সপরিজন বন্দী করে কোলকাতায় নিয়ে গিয়ে ফেলেতাঁদের বিচার করা হোক। কমিটি বিশ্বাস করেন যে, তাহলে তাঁদের সব কারসাজি ধরা পড়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর তছরূপ করা লাখ লাখ টাকাও আদায় হয়ে আসবে। তবে ধরপাকড়ের কাজটা অতি সন্তর্পণে হাসিল করতে হবে, যেন কাকপক্ষীও আগের থেকে কিছু জানতে না পারে যে, কোথায় কি হচ্ছে। তা না হলে সবই মাটি।

হেস্‌টিংস বরখাস্ত সোজাসুজি মহম্মদ রেজা খাঁকে তাঁর পদ থেকে

বরখাস্ত করারই পক্ষপাতী ছিলেন। তদন্ত-ফদন্ত বিচারপরথ তাঁর আদবেই মনঃপূত ছিল না। তাঁর ধারণা, যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন আর তাই নিয়ে মাতামাতি করলে কোনোই লাভহবে না। তাছাড়া রেজা খাঁ এক কেষ্টবিষ্টু মানুষ, তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষীসাবুদ পাওয়া খুবই কঠিন। ওসব হাঙ্গামা করতে গেলে সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কোনো ফয়দা হওয়ার সম্ভবনা নেই। তবে ডিরেক্টরদের আদেশ। তাঁরা বেশ জোর দিয়েই হুকুম করেছেন। সুতরাং সে আজ্ঞা পালন না করে তো উপায় নেই।

বিহারের নায়েব দেওয়ান রাজা সিতাব রায়। সরকারী কাজে তাঁর কোনোই গলদ ছিল না। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তেমন কিছু ছিল না। কিন্তু বিহারের দেওয়ানি চালানোর জন্যে তাঁকে রেজা খাঁর সঙ্গে মাখামাখি করে চলতে হয়েছে। সুতরাং অসৎ সঙ্গে বাসের ফল তাঁকেও তো খানিকটা ভোগ করতে হয়।

সিক্রেট কমিটির চিঠি পাওয়ার পরদিনই হেস্টিংস মুর্শিদাবাদের রেসিডেণ্ট স্যামুয়েল মিডলটনকে খবর পাঠালেন, পত্রপাঠ যেন মহম্মদ রেজা খাঁ আর অমৃত সিংহকে বন্দী করে কোলকাতায় চালান করে দেওয়া হয়। কিন্তু সব যেন সারা হয় চুপিচাপি, অতি সংগোপনে। হেস্টিংস তাঁর কাউনসিলকেও কোনো কথা ঘুণাক্ষরেও জানালেন না। তিনদিনে গভর্নরের অর্ডার মুর্শিদাবাদে গিয়ে পৌঁছল! মিডলটন পল্টনের অধ্যক্ষ ক্যাপটেন অ্যান্ডারসনকে ডেকে গোপনে পরামর্শ করে সব ঠিকঠাক করে ফেললেন। তখনো ভোর হতে ঘণ্টাখানেক বাকি। ইংরেজদের চার দল তেলেঙ্গী সেপাই নিঃশব্দে রেজা খাঁর নিসাদ-বাগের বাগানবাড়িতে গিয়ে সমস্ত বাড়িটা ঘেরাও করে ফেলে পাহারাওয়ালাদের ঘুমন্ত অবস্থাতেই আটক করে ফেলল।

মিডলটন বাড়ির ভিতর গিয়ে রেজা খাঁকে জাগিয়ে তাঁকে গভর্নরের আদেশ জানিয়ে দিলেন। ইংরেজদের শাক্তিসামর্থ্যের

পরিমাপ রেজা খাঁর একটুও অবিদিত ছিল না। তিনি জানতেন গভর্নরের হুকুম তামিল না করাটা মুখখুমির একশেষ হবে। তিনি খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে কপাল চাপড়িয়ে বুঝিয়ে দিলেন, ভাগ্যে যা হবার আছে তাই-ই হোক। এক সময় ইংরেজরাই তাঁকে সমাদর করে উঁচু কোঠায় তুলেছিলেন, আজ তাঁরাই আবার তাঁর হাতে দড়ি দিচ্ছেন। তাঁতে বলার আর কি আছে? রেজা খাঁ ধীরে ধীরে মিডলটনের পিছন পিছন বাইরে বেরিয়ে এলেন। সেপাইদের পাহারায় তাঁকে ঘেরা পালকিতে ভরে পলাশী হয়ে অগ্রদ্বীপে নিয়ে যাওয়া হল। সেখান থেকে বজরায় তুলে কোলকাতা চালান করে দেওয়া হল।

তারপর রেজা খাঁর শহরের বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারবর্গকেও বন্দী করা হল। অমৃত সিংহও ধরা পড়লেন। সবাইকেই কোলকাতায় পাঠানো হল। সমস্ত কাজই খুব সাবধানে করা হল, যাতে কারো কোথাও একটুখানিও সম্ভ্রম নষ্ট না হয়। প্রত্যেককেই তার উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হল।

মিডলটন সঙ্গে সঙ্গেই হেস্‌টিংসকে খবর পাঠিয়ে দিলেন, মহম্মদ রেজা খাঁ কোলকাতা চলেছেন। সেই তখন হেস্‌টিংস ব্যাপারটা তাঁর কাউনসিলকে প্রথম খুলে বলবেন। ডিরেক্টররা যে নানা কারণে রেজা খাঁর উপর বিরূপ হয়ে আছেন, সেকথা কাউনসিলরদের সবাইকার জানা ছিল। সুতরাং তাকে কোলকাতায় ধরে নিয়ে আসা হচ্ছে শুনে কেউই তেমন আশ্চর্য হলেন না। তবে তিনি কোলকাতা পৌঁছলে তাঁকে কিভাবে গ্রহণ করা হবে, তাই নিয়ে তাঁদের মধ্যে একটু কথা কাটাকাটি চলল। শেষে স্থির হল, কাউনসিলর জন্ গ্রেহাম কাউনসিলদের তরফ থেকে রেজা খাঁকে দস্তুরমতো আদর-আপ্যায়ন করে সমরোহে তাঁকে তাঁর চিৎপুরের বাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে আসবেন। আসল কথা, সময়ে-অসময়ে মহম্মদ রেজা খাঁর হাত থেকে প্রায় সব

কাউন্সিলরই ইতরবিশেষ দাক্ষিণ্য লাভ করেছিলেন। নগদ বিদায় ছাড়াও নিজস্ব কারবারে তাঁরা নায়েব-দেওয়ানদের কাছ থেকে যথেষ্ট সুযোগসুবিধা পেয়েছিলেন। জন্ গ্রেহাম তারই মধ্যে একটু বেশি। দীর্ঘকাল বর্ধমানের রাজস্ব আদায়ের কাজে তদ্বির-কারক ছিলেন বলে নায়েবের অনুগ্রহটা তাঁর ভাগ্যে খানিকটা বেশি করেই বর্তে ছিল। বিনি পয়সায় কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপনের ঐ সুযোগ তাঁরা ছাড়েন কি করে? হেস্টিংসের সদযুক্তি—যাঁকে বিচারের জন্যে ধরে আনা হয়েছে তাঁকে আবার আদর-অভ্যর্থনা কেন।—তাঁদের মনঃপূত হল না।

কোলকাতার উত্তর-অঞ্চলে চিৎপুরের খাল যেখানে গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে তার প্রায় গায়েই মহম্মদ রেজা খার বাড়ি। বাড়ি নয় তো রাজবাড়ি। প্রকাণ্ড হাতা। বহুদূর বিস্তৃত বাগান-বাগিচা। সব কি সাজানো গোছানো, যেন ইন্দ্রপুরী। পরবর্তীকালে রেজা খাঁর বংশীয়রা কোলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছিলেন। তখন তাঁরা চিৎপুরের নবাব বলে আখ্যাত হতেন। কিন্তু কালক্রমে তাঁরা কোথায় যে উড়ে গেলেন তার ঠিকানা কেউ আর দিতে পারে না। রেজা খা সেই বাড়িতেই গিয়ে উঠলেন। কোম্পানীর পাহারাওয়ালা বাড়ির পাহারায় রইল বটে, কিন্তু এমনভাবে রইল যে দেখলেই মনে হত তারা যেন নায়েব বাহাদুরেরই সেপাইশান্ত্রী।

রেজা খাঁর হাতে বিস্তর টাকা। মীরজাফরের নবাবির আমলে তিনি ঢাকার ডেপুটি গভর্নর ছিলেন, তখন সেখান থেকে বহু অর্থ সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন। মীরজাফরের মৃত্যুর পর সে টাকা খুব কাজে এসেছিল। সেই টাকার থেকে বেশখানিকটা ইংরেজ-মাতব্বরদের হাতে তুলে দিতে পারায় তিনি নবাব নজমউদ্দৌলার ডেপুটি, অর্থাৎ বাংলার নায়েব-নাজিমের পদ সহজেই পেয়ে গিয়েছিলেন। সে-টাকা বের করায় তাঁর ক্ষতি কিছু হয় নি। কারণ ইংরেজ মুরুব্বিদের প্রসাদে কোম্পানী-দেওয়ানের ও নায়েবের

পদ পেতে তাঁর বেশি দেরি হল না। নায়েব-দেওয়ানের ও মাইনেই ছিল বছরে ন-লাখ টাকা। তার উপর নবাবের পাওনা বছরে বত্রিশ লাখ তাঁরই হাত দিয়ে যাতায়াত করত। উপরির কথা ছেড়ে দিলুম। তবে টাকার চেয়ে যেমন টাকার সুদ মিষ্টি তেমনি উপরি না থাকলে সেকালে চাকরিতেও তো কোনো সুখ ছিল না।

এ পর্যন্ত প্রায় সাত বছর ধরে মহম্মদ রেজা খাঁ নায়েব-নাজিম আর নায়েব-দেওয়ান হয়ে বাংলা দেশের উপর প্রভুত্ব করে এসেছেন। বাংলার অপোগণ্ড নবাবদের কেই-বা চিনত? ছোটো নবাব মহম্মদ রেজা খাঁ মুজফফরজঙ্গ বাহাদুরকেই সবাই বাংলার আসল নবাব বলে জানত। সুতরাং সবকিছু মিলিয়ে তাঁর হাতে যে টাকার ছড়াছড়ি তাতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু নায়েব-বাহাদুর অতিশয় চালাক লোক। পাছে টাকা ছড়াতে থাকলে লোক অন্যকিছু ভাবে তাই তিনি কোলকাতায় আসা অবধি নিতান্ত গরীবানা চালেই চলছিলেন। যেখান থেকে পারেন ধারকর্জ করে বসতেন। লোকে ভাবত তাঁর ট্যাঁক বুঝি সত্যিই খালি হয়ে গেছে। ধারণাটা দৃঢ় হল যখন কোলকাতায় আনার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চারদিকে প্রকলামেশন বেরিয়ে গেল, বাংলা- বিহার-উড়িষ্যার রাজস্ব আদায় এখন থেকে মুর্শিদাবাদ আর পাটনার রেভিনিউ কাউনসিলের দ্বারাই করানো হবে, নায়েব-দেওয়ানের মারফত নয়। হেস্‌টিংস নাবালক নবাবকে দিইয়ে রেজা খাঁকে নায়েব-নাজিমের পদ থেকেও বরখাস্ত করিয়ে দিলেন। কয়েক দিন পরে পাটনা থেকে সিতাব রায়কেও কোলকাতায় ধরে আনা হল।

কিন্তু বন্দী দুজনের বিচার অতো শিগগিরই আরম্ভ হল না। হেস্‌টিংস দেখলেন চারিদিকে রেজা খাঁর এখনো যেমন প্রভাব প্রতিপত্তি তাতে তখনই তাঁর বিচার আরম্ভ করে দিলে সুবিধার

কিছু হবে না। তাই তিনি গড়িমসি করতে লাগলেন। খানিকটা দেরি হয়ে গেলে সাক্ষীসাবুদ পেতে হয়তো একটু সুবিধা হতে পারে। তাছাড়া ঐ সংক্রান্ত ডিরেক্টররা একটা বড়ো অদ্ভুত ফরমাশ করেছিলেন। তাঁরা গোপনে হেস্‌টিংসকে জানিয়ে দিয়েছিলেন রেজা খাঁর গোলমেলে কাণ্ডগুলো নন্দকুমারের যেমন জানা তেমনটি আর কারো নয়। নন্দকুমার রেজা খাঁর ঘোর শত্রু। সুতরাং তাঁকে ভালোরকমের একটা বখশিশ কবলালে রেজা খাঁর বিরুদ্ধে সব সাখ্যিপ্রমাণ তিনিই যোগাড় করে দেবেন। কিন্তু খুব সাবধান নন্দকুমারকে যেন পুরোপুরি বিশ্বাস করা না হয় আর তাঁর হাতে যেন সত্যিকারের কোনো ক্ষমতাও তুলে না দেওয়া হয়। তাঁদের প্রেসিডেণ্ট হেস্‌টিংস নন্দকুমারকে বেশ ভালো করেই চেনেন, সুতরাং বেশি-কিছু বলা বাহুল্য।

ডিরেক্টরদের ঐ নির্দেশ হেস্‌টিংসের অত্যন্ত বিদখুটে বলে মনে হল। কিন্তু কি আর করেন। মনের বিরক্তি মনেই চেপে রেখে তিনি নন্দকুমারকে ডেকে তার উপর প্রমাণ সংগ্রহের ভার বসিয়ে দিলেন। ডিরেক্টরদের মতো তিনিও কি বুঝলেন না যে, রেজা খাঁর উপর দারুণ বিদ্বেষবশতঃ নন্দকুমার তার বিরুদ্ধে যে সব প্রমাণ উপস্থিত করবেন সেগুলো প্রমাদেই দাঁড়িয়ে যাবে। সে সব প্রমাণ সত্যের বদলে মিথ্যের ঠেস দিয়ে ভরাট করা হবে।

যাই হোক, হেস্‌টিংসের হাতে অনেক কাজ। তিনি কোলকাতায় বসে থেকে সময় নষ্ট না করে দলবল সমেত মফঃস্বল ঘুরতে বেরিয়ে পড়লেন।

তাঁর প্রথম গন্তব্যস্থল কৃষ্ণনগর।

পাঁচ

মফঃস্বল ঘোরার কথাটা তাহলে আর-একটু খোলসা করে বলতে হয়।

জমিজমা ঠিকমতো বিলি করা, জমার পরিমাণ কি হবে তা ধার্য করা, খাজনা আদায়ের সুবন্দোবস্ত করা—এসবই ছিল দেওয়ানের কাজ। কোম্পানী যখন নামের খোলস ছেড়ে কাজেও দেওয়ান হবেন বলে স্থির করলেন, তখন তো ঐসব কাজের ভার স্বভাবতই গভর্নরের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। হেস্‌টিংস সে-দায় মাথা পেতেই গ্রহণ করলেন। কোম্পানীর প্রাপ্য রাজস্বের পরিমাণ যেরকম কমতির দিকে চলেছে তাতে সেদিক থেকে তখনই একটা-কিছু বিহিত না করলেই নয়। আরো ছ'মাস আগে কাজে লাগতে পারলে ভালো ছিল।

ডিরেক্টরদের মনে ঠিক যে কি ছিল তা অবশ্য বলা দুষ্কর। কিন্তু হেস্‌টিংস যে প্রজার দুঃখ যাতে দূর হয়, জমিদাররা যাতে তাদের উপর অত্যাচার করতে না পারে অথচ দেওয়ানের প্রাপ্য পাওনাগণ্ডাও যাতে ঠিকঠাক আদায় হতে থাকে তার চেষ্টা প্রাণপণ করেছিলেন সে-বিষয়ে একটুও কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তাঁর অক্লান্ত চেষ্টা পুরোপুরি কাজে দাঁড়ায় নি, কেন যে দাঁড়ায়নি, সে কথাই বলা হচ্ছে।

প্রধান কারণ হল, সুবে বাংলায় রাজস্ব-সংক্রান্ত ব্যাপারে না হেস্‌টিংস না ইংরেজ কর্মচারীদের কারো একটা পরিষ্কার ধারণা ছিল। তাঁরা কেউই ঠিক জানতেন না যে, জমিদারি পরগণাগুলোর ঠিক কি পরিমাণ মালগুজারি ধার্য করলে সেটা ন্যায্য হবে। সেটা ঠিক করে বুঝে ওঠবার উপকরণ তাঁদের হাতে

ছিল না। সেসব ছিল জমিদারদের সেরেস্তায়। আর ছিল সরকারী কানুনগোদের দপ্তরে। কানুনগোরাই ছিলেন ছোটো ডিরেক্টর অভ ল্যাণ্ড রেকর্ডস। প্রত্যেকটি জমার পুংখানুপুংখ বিবরণ ছিল ঐ দুই শ্রেণীর লোকদের নখদর্পণে।

কিন্তু সেসব অন্যের কাছে ফাঁস করে দেওয়াটা তাঁদের কারো স্বার্থেরই অনুকূল ছিল না। জমিদাররা তাঁদের জমিদারি থেকে খাজনা ছাড়া আরো অনেক রকম আয়ের আমদানি করতেন। সেসব অবশ্য তাঁদের ন্যায্য পাওয়া নয়। তবে অনেকদিন ধরে চলে আসছে বলে তা রেওয়াজ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সেসবের সত্যিকার হিসেব অন্যকে জানতে না দেওয়ার মধ্যে অস্বাভাবিক একটু কিছু ছিল না, আর কানুনগোরা জমার প্রকৃত বিবরণ অপরকে জানিয়ে দিলে তো তাঁদের পৈতৃক ব্যবসাই মাটি, তার মূলেই হাভাত।

সুতরাং কোম্পানীর হাতে দেওয়ানি আসা থেকে লর্ড কর্নওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত পর্যন্ত, অর্থাৎ ১৭৬৫ থেকে ১৭৯৩ সাল পর্যন্ত প্রজারা জমিদারদের ন্যায্য ঠিক কি দিত আর জমিদাররা রাজস্ব বাবদ দেওয়ানের দপ্তরে যে টাকা জমা করতেন, সে-দুয়ের বিয়োগ-ফলটা যে কি দাঁড়ায় তা কোম্পানীর কর্মচারীদের কাছে বরাবরই একটা গোলকধাঁধার মতো হেঁয়ালি থেকে গিয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর অবশ্য তাই নিয়ে তাঁদের আর মাথা ঘামানে হয় নি। তবে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত একটা আন্দেমৌজে থাউকো জমার উপরই প্রতিষ্ঠিত, সূক্ষ্ম কোন হিসেবের উপর নির্ভর করে নয়।

একটা উপায় অবশ্য ছিল। কিন্তু সেটা একটা বৃহৎ ব্যাপার। আর তাতে ব্যয়ও বিস্তর। সুবে বাংলার সমস্ত জমির একটা ভালো রকম জরিপ করিয়ে নিলে একটা সুরাহা হত বটে. কিন্তু কারবারী ব্যক্তিরা বরাবরই একটু দৃষ্টি-কৃপণ। তাঁদের চোখের

সামনে দিয়ে বস্তা বস্তা মোহর পার হয়ে গেলে সে কিছু নয়: তাঁরা শুধু পাই পয়সার হিসেব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরেন। ডিরেকটরদের সভায় জরিপের কথাটা একবার উঠেছিল। উঠতেই তাঁরা এমন ভিরমি যেতে লাগলেন যে, কথাটা আর অগ্রসর হয় নি। তাছাড়া স্রেফ দিশি লোকদের তদারকিতে জরিপ করালে তেমন কোনো ফল পাওয়া যেত না। ওদিকে কোম্পানীর ইংরেজ কর্মচারীরা ও বিষয়ে নিতান্তই অনভিজ্ঞ। মালের দরদস্তুর বেচাকেনার হিসেবেই তাঁরা অভ্যস্ত, জমি মাপজোপের হিসেব নিকেশ তাঁদের মাথায় সহজে ঢুকত না।

তবু গতি একটা কিছু তো করা চাই? পূর্বেকার আমলে বৈশাখ মাসের একটা শুভদিন বেছে পুণ্যাহের আয়োজন করা হত। ঐ সমস্ত জমিদার তালুকদার জোতদার ইত্যাদিকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে জড়ো করে আবার এক বছরের জন্যে নতুন করে জমা বন্দোবস্ত করা হত। বলা বাহুল্য প্রতি বছরই তাইতে জমার অঙ্ক খানিকটা করে বৃদ্ধি পেয়ে যেত। অবশ্য তাতে করে দুধে হাত পড়ত না। তবে জমিদারের বছর বছর খরচান্ত হতে হত আর থাকা-খাওয়ার দরুণ নানা অসুবিধাও ভোগ করতে হত। তার উপর ছিল নজরানা। রাজধানীতে গিয়ে নবাব-সাহেব, ছোটো নবাব আর অন্যান্য মহৎ জনের দর্শন তো খালি হাতে পাওয়া যেত না। প্রত্যেকেরই দর্শনীয় একটা হার নির্দিষ্ট করা ছিল। গোড়াতেই সেই-মতো মোহর-আশরফি লাল রুমালে বেঁধে পেশ করতে হত, নইলে শুধু হাতে আর্জি পেশ করাটা একটা চূড়ান্ত বেয়াদবি বলে মনে করা হত।

হেস্টিংস ঠিক করলেন, তিনি কয়েকজন পুরনো কাউনসিলরকে সঙ্গে নিয়ে প্রত্যেকটি জমিদারি-পরগণা ঘুরে ঘুরে দেখবেন। তার পর সব দেখেশুনে জমার পরিমাণ ধার্য করে জমি বিলি করবেন। কাউনসিল হেস্টিংসের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাওয়াতে

এক কমিটি অভ সারকিট খাড়া করা হল। তার একদল যাবেন গঙ্গার পূর্বপারের পরগণাগুলো বিলি করতে হেস্টিংসের কর্তৃত্বে। আর একদল যাবেন উইলিয়ম অলডারসে বলে এক প্রবীণ বিচক্ষণ কাউনসিলরের নেতৃত্বে গঙ্গার পশ্চিমপারের পরগণাগুলোর বন্দোবস্ত করতে। সবদিক বিচার বিবেচনা করে স্থির হল আপাততঃ পাঁচ বছরের মেয়াদী ইজারায় জমি, রাজস্ব, খাজনা ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক কিছুই দরকারী খবর জানা হয়ে যাবে।

আরো ঠিক হল প্রত্যেক পরগণায় একজন করে ইংরেজ কালেকটর থাকবেন, আর তাঁর সঙ্গে তাঁর সাহায্যে থাকবেন একজন করে দিশি দেওয়ান। রাজস্ব-আদায়ই তাঁদের প্রধান কাজ হবে। ভালো করে কাজ চালাবার জন্যে কতকগুলো নিয়মও বেঁধে দেওয়া হল। চোদ্দটা বিধির মধ্যে তিনটি ছিল ওরই মধ্যে একটু ভারিক্কেগোছের। নিয়ম হল, অতঃপর কোনো কালেকটরই আর নিজের খাতে ব্যবসা-বানিজ্য করতে পারবেন না। ইংরেজদের কোনো গোমস্তা-ব্যানিশান কোনো জমিদার বিলি নিতে পারবেন না। আর রাজস্ব-আদায়ের জন্যে পরগণা সেপাই নিয়ে গিয়ে জমিদারদের ধরপাকড় করা চলবে না।

সকলেই স্বীকার যাবেন, নিয়মগুলো অতি উত্তম। কিন্তু অনেক শুভ সংকল্পের মতো ওগুলোও কোনো কাজে দাঁড়ায় নি। কালেকটরদের ব্যবসা আগে যেমন চলছিল ঠিক তেমনই চলতে লাগল, তবে স্বনামে নয়, তাঁদের সরকার গোমস্তাদের বেনামে। আর ব্যানিয়ানদের জমি বিলি নেওয়া? সে-বিষয়ে তো খোদ গভর্ণর সাহেবের পেয়ারের ব্যানিয়ান কান্তবাবুই তো রাম-আসামী। অন্যদের কথা তো ছেড়েই দেওয়া গেল। স্বনামে-বেনামে তাঁর জমার পরিমাণ ছিল বছরে তের লাখের কিছু উপর। তাইতেই না কান্তমুদি—কান্তবাবু? রংপুর জেলার পরগণাগুলোর বন্দোবস্তের সময় সেখানকার বিখ্যাত বাহিরবন্দ পরগণা ঐ সময়েই

রানী ভবানীর অধিকার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কান্তবাবুর নাবালক ছেলে লোকনাথের নামে জমা করে নেওয়া হয়েছিল। পরগণা সেপাইদের হাত থেকেবেঁচে গেলেন বটে, কিন্তু প্রজারা বাঁচেন নি। সেপাইদের ইংরেজ অধ্যক্ষদের টাকা খাইয়ে জমিদাররা প্রজা-নির্যাতনের যে কাজে লাগাতেন, তার নিদর্শন বড়ো কম পাওয়া যায় না। ইংরিজীতে একটা প্রবাদ আছে; পারলামেণ্ট আইন পাস করতে পারে বটে, কিন্তু তাই দিয়ে অসৎকে সৎ করে তুলতে পারে না। খুব খাঁটি কথা।

তবে কলেকটররা যে একেবারে কিছু করেন নি তা বললে কিন্তু অপরাধ হবে। জমিদারদের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করার কাজে তাঁরা বেশ খানিকটা তৎপরতা দেখিয়ে ছিলেন, প্রজাদের ভাগ্যের উপর সব দোষ চাপিয়ে দিয়ে হাত-পা গুটিয়ে উদাসীন হয়ে বসে থাকেন নি। তবে প্রজাদের উপর জমিদারের অত্যাচারের কথা একটু বেশী মাত্রাতেই সব সময় প্রচার আছে। এই সেদিন পর্যন্তও আমরা জমিদারের নামে বিভীষিকা দেখতুম। একটু তলিয়ে ভেবে দেখলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, ওপরতলার লোকেদের হাত থেকে নিচের তলার লোকেরা নিগ্রহ বই আর-কিছু তো কখনো লাভ করে নি। মানুষ সামান্য একটু ক্ষমতা হাতে পেলেই কেমন যেন মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে। তখন সে তার অধীন ব্যক্তিদের উপর অত্যাচার শুরু করে দেবেই দেবে। ওটা তার প্রকৃতিগত একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। তাতে ভয় পাবার কিছু নেই।

যাই হোক, কৃষ্ণনগরে পৌঁছেই কমিটি অভ সার্কিট চটপট কাজে নেমে পড়লেন। ভালো করে খবরাখবর নিয়ে সব দেখে-শুনে ভেবে-চিন্তে কাজ করার মতো ফুসরত তাঁদের হাতে ছিল না। বাংলা বছর কাবার হতে চলল। তাই তাঁরা পরগণার পুরানো জমিদারদের ডাকিয়ে তাঁদেরকে জানিয়ে দিলেন,

কোম্পানী পাঁচ বছরের মেয়াদী ইজারায় তাঁদের সঙ্গে জমা বন্দোবস্ত করতে রাজি আছেন, এখন মালগুজারি তাঁরা কি দেবেন তাই বলুন। এদেশে যা হয়ে থাকে তাই হল। জমিদাররা নানা ব্যায়নাক্কা তুলে এমন অসম্ভব কম দর হাঁকলেন যে কমিটির তো চক্ষুস্থির। কিন্তু তাঁরা আর কথা না বাড়িয়ে পরগণাগুলো সোজা লাটে উঠিয়ে দিলেন, অর্থাৎ নিলামে চড়িরে সবচেয়ে বেশি যে ডাক পাওয়া যাবে তাতেই আপাততঃ জমিদারি বিলি করা মনস্থ করলেন।

তখন জমিদাররা পড়ে গেলেন বিষম ফাঁপরে। তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন, খানিক দরদস্তুর চলবে; তাররর টানা-হেঁচড়া করতে করতে মাঝামাঝি একটা কিছু রফা হয়ে যাবে। সাহেবরা যে কিছু না বলে কয়ে ফস করে ডাক যে নিলামে চড়িয়ে দেবেন সেটা কারো মাথাতেই আসে নি। নিলামে ঝোঁকের মাথায় জেদাজেদি করে ডাক দিতে থাকায় সব জিনিসেরই দাম চড়ে উঠে একেবারে তালগাছ হয়। হিসেব করে কাজ করলে জমার পরিমাণ ন্যায্য যা দাঁড়াত নিলামে তারই অঙ্ক দাঁড়িয়ে গেল ন্যায্যের চতুর্গুণ বেশি।

তবে সাহেবরা কিঞ্চিৎ দয়া করলেন। পরগণাগুলো নিলামের দরেই তাঁরা পুরনো জমিদারদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করতে রাজি হলেন। সাবেক মর্যাদা খোয়াবার ভয়ে কতক জমিদার ঐ চড়া দরেই ইজারা নিলেন। কিন্তু বেশির ভাগই শেষ পর্যন্ত তাল রাখতে পেরে উঠবেন না ভেবে মুখ চুন করে বাড়ি ফিরলেন। তাঁরা সরে যেতেই ভুঁইফোড় আগন্তুকের সেই সবজমিদারি লুফে নিলেন। তাঁদের অধিকাংশই ইংরেজদেরই হিন্দু সরকার গোমস্তা ব্যানিয়ান। নতুন পয়সা করেছেন। তাই ছড়িয়ে তাঁরা জমিদারি কিনে এখন বাবু বনতে চান। তাই তাঁকের উৎসাহ ডিঙ্‌ মেরে তাঁদের কাণ্ডজ্ঞানকে ছাড়িয়ে গেল।

হেস্‌টিংস আর তাঁর কমিটি সদুদ্দেশ্য নিয়েই বেরিয়ে ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়ে বসলেন। যা দাঁড় করালেন সেটা একটা বিষচক্র। তাতে কারো-কিছু ভালো হল না। পুরনো জমিদাররা প্রজাদের উপর একটু আধটু অত্যাচার করলেও তাদের অসময়ের বন্ধু ছিলেন। তাদের সুখ-দুঃখ বুঝতেন, অভাব অভিযোগ শুনতেন, সে-সবের যথাসম্ভব প্রতিকারও করতেন। কিস্তির খাজনা যোগাড় করতে না পারলে সময় দিতেন। উচ্ছেদ করে না দিয়ে আস্তে আস্তে বাকিপড়া খাজনা শোধের ব্যবস্থা করে দিতেন।

তাঁদের জায়গায় নবাগত যাঁরা এসে বসলেন, তারা তো গোড়া থেকেই জানতেন তাঁদের মেয়াদ মাত্র পাঁচ বছরের। ঐ সময়ের মধ্যেই যা-কিছু করবার তা করে নিতে হয়। ঐ জবর রকমের রাজস্ব দিয়ে তাঁদের পেট ভরাবার মতো তো হাতে কিছু থাকা চাই? আর, পেটও তাঁদের নেহাত ক্ষীন ক্ষুদ্র নয়, বেশ একটু স্থূলেরই দিকে। সুতরাং তাঁরা যে প্রজাদের উপর মারধোর লাগিয়ে টাকা শোষণ করবেন, সে তো ধরাকথা। কমিটি নিয়ম করে সবরকম আবওয়াব প্রভৃতি অতিরিক্ত খাজনা কাগজেকলমে তুলে দিলেও কার্যত দেখা গেল সেগুলো আরো কায়েমী হয়ে চেপে বসেছে।

ঐসব অভিনব জমিদারকুলের অত্যাচারের কাহিনী ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা আছে। উত্তর বঙ্গের অনেক পরগণার ইজারাদার দেবী সিংহের দৌরাত্ম্যের কথা কার না-জানা? সেটা যতটা রটেছিল ততটা না হলেও অতিরঞ্জিত কিছুই নয়। ওরকম কতশত দেবী সিংহ যে তখন সুরে বাংলার আনাচে-কানাচে মাথা গজিয়ে উঠেছিল তার হিসেব অঙ্ক কষে কে নিরূপণ করবে? বনেদী জমিদাররা, যাঁরা মানরক্ষার খতিয়ে ঐ চড়া দরে জমিদারি রেখেছিলেন, তাঁরা তো শুরু থেকেই কিস্তি খেলাপ করে কেউ

জেলে পচে মরতে লাগলেন, কেউ বা আবার ফেরার হয়ে দেশ ছাড়লেন। নবীন জমিদারদের কেউ কেউ পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হবার আগেই কিস্তি খেলাপ করে গা-ঢাকা দিয়ে রইলেন! জমিদারি এমন অবস্থায় রেখে গেলেন যে তার থেকে দীর্ঘকাল আর কিছু পাবার কোনো আশা রইল না। সব নিয়ে সে এক বিতিকিচ্ছির কাণ্ড। এতে করে সুবিধা কারো হল না, না জমিদারদের, না প্রজাদের, না কোম্পানীর।

ওদিকে ডিরেক্টররা যখন দেখলেন রাজস্ব কমে গেছে অথচ জেলায় জেলায় ইংরেজ কলেক্টর রাখার খরচ বেড়ে চলেছে তখন তাঁরা কলেক্টরের পদ উঠিয়ে দেবার জন্যে লিখে পাঠালেন। দিশি দেওয়ান দিয়েই কাজ চালানোর নির্দেশ দিলেন। লাভ-লোকসান ডিরেক্টররা একটু বেশি করেই বুঝতেন। গভর্নমেন্ট চালানোকেও তাঁরা একটা কারবারই বলে ধরে নিয়েছিলেন। কিন্তু দিশি লোক দিয়েও বেশি দিন কাজ চালানো যায় নি, তাই কলেক্টরদের আবার ডেকে এনে জেলায় জেলায় বসিয়ে দিতে হয়েছিল।

বুদ্ধিমান হেস্‌টিংস নিজেও তাঁর রাজস্ব সংস্কার ব্যাপারটা যে তেমন ভালো দাঁড়াতে পাচ্ছে না, সেটা অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ধরে ফেলেছিলেন। তাই তিনি এক নতুন পদ্ধতিতে জমিদারি বিলি করার খসড়া বানিয়েডিরেক্‌রদেরকাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেটা মোটামুটি লর্ড কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তেরই কাছাকাছি যায়। কিন্তু ডিরেক্টররা সেটা অগ্রাহ্য করে সরাসরি নামঞ্জুর করে দিয়েছিলেন। তাই পাঁচশালা বন্দোবস্তের মেয়াদ শেষ হতেই আবার সেই পুরানো সাল সাল জমা বিলির বন্দোবস্ত ফিরে এসেছিল। সেটা চলেছিল লর্ড কর্ণওয়ালিয়ের দশশালা বন্দোবস্তর আগে পর্যন্ত। হেস্‌টিংসের পাঁচসালা বন্দোবস্ত কাজে কিছু না দাঁড়ালেও তিনি যে দেশের হিতের জন্যে এগিয়ে গিয়ে ছিলেন, সেইটেই হল তাঁর গৌরব।

ন'দে জেলার পরগণাগুলোর বিলি বন্দোবস্ত করে উত্তর আর পূর্বে বঙ্গের পরগণাগুলো ধরবার উদ্দেশ্যে হেস্‌টিংস তাঁর কমিটি অভ সার্‌কিট নিয়ে রাজধানী মুর্শিদাবাদে গিয়ে উঠলেন। তাঁর মনে অন্য আরো অনেক মতলব ভাঁজা ছিল।

ছয়

রাজধানী মুর্শিদাবাদ।

কিন্তু বেশিদিন তাকে রাজধানী থাকতে হল না। হেস্‌টিংস ঠিক করেই এসেছিলেন সুবে বাংলায় কোম্পানীই হবেন—একশ্চন্দ্রঃ। দ্বিতীয় আর-কারো সেখানে প্রভুত্ব করা চলবে না। কাজে তো নয়ই নামেও না। তার প্রথম ধাপ হল, সুবে বাংলার রাজধানীকে মুর্শিদাবাদ থেকে উঠিয়ে তাকে ইংরেজদের খাঁটি ম্লেচ্ছ শহর কোলকাতায় নিয়ে গিয়ে বসানো। দ্বিতীয় ধাপ হল, বাংলার নবাবকে বাংলার মসনদে বসিয়ে নবাবি-নবাবি খেলানো।

জুন মাসের শেষাশেষি হেস্‌টিংস দলবল নিয়ে মুর্শিদাবাদ পৌঁছলেন। ওদিকে অল্‌ডারসে সাহেব তাঁর কমিটি নিয়ে চব্বিশ পরগণার জমিবিলির কাজ সেরেহুগলী, যশোর, মেদ্‌নিপুর, বীরভূম আর বিষ্ণুপুরের (বাঁকুড়ার) পরগণাগুলোকে একে একে ধরতে গেলেন। বিহারের পরগণাগুলো আপাতত পড়ে রইল। কেননা, তাদের বাৎসরিক বন্দোবস্ত কমিটি অভ সারকিট কাজ শুরু করার আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল।

নবাব মোবারকউদ্দৌলা নিতান্তই ছেলেমানুষ॥ বয়স বারো কি তেরো হবে। বাইরের সব ব্যাপার নায়েব-নাজিম মহম্মদ রেজা খাঁর হাতে থাকলেও বাড়ির ভিতরকার কর্তৃত্ব কার হাতে থাকবে তাই নিয়ে মীরজাফরের দুই বেগম মুন্নীবেগম আর বব্বু-বেগমের মধ্যে রেষারেষির ধূম পড়ে গিয়েছিল। মীরজাফরের আমলেই বুদ্ধিমত্তার দরুন অন্দরের কতৃ'ত্ব মুন্নীবেগমেরই হাতে গিয়ে পড়েছিল। তাঁর নিজের দুই ছেলে নবাব নজমউদ্দৌলা আর সৈফুদ্দৌলা দু'জনেই অল্পবয়স্ক হওয়ায় সেই কতৃত্ব অনেকদিনই

স্থায়ী হয়েছিল। এখন নতুন নবাবের মা বব্বুবেগম সেটা ধরবার জন্যে হাত বাড়ালেন। কিন্তু কর্তাত্বি করার স্বাদ মুন্নীবেগম যখন একবার পেয়েছেন তখন তিনি সেটাকে অন্যের হাতে কি করে স'পে দিতে পারেন? বিশেষ করে সপত্নীর হাতে? দুই বেগমের তুমুল রেষারেষিই হল অন্দরের পলিটিক্স।

মুন্নীবেগম জাতকুলে কিঞ্চিৎ খাটো হলেও কূটকৌশলে অনেক পুরুষমানুষকেই হার মানান। নিচু থেকে উঁচু অবস্থায় ওঠাতে তাঁর স্বভাবে একটু উদ্ধত ভাব ঢুকে পড়লেও তিনি কখনো গর্বে আত্মহারা হন নি। তিনি বেশ বুঝতেন, ওটা কার্যসিদ্ধির মস্ত অন্তরায়। তাই পরিজন সকলেরই উপর তাঁর ভদ্র ব্যবহার। গুণিজনের প্রতি সশ্রদ্ধ আচরণ। দানধ্যান প্রচুর। কিন্তু তিনি কখন অপাত্রে দান করতেন না। পলিটিক্সের খেলা মুন্নীবেগম যেমন ভালো বুঝতেন ঠিক তেমনিই ভালো খেলতেনও। তাঁর স্বভাব চরিত্র সে সময়কার বিধি-বেগমদের মতো আদপেই ছিল না। তাঁর বিবাহিত ও বৈধব্য দুই জীবনই একেবারে নিষ্কলঙ্ক। কি ইংরেজ আর কি মুসলমান কোনো লেখকই তাঁর চরিত্রে ফোঁটা কালি লেপতে পারেন নি।

হেস্টিংস মুর্শিদাবাদে আসছেন শুনেই মুন্নীবেগম বুঝতে পেরেছিলন এইবার নবাব-সংসারের কর্তৃপদ নিয়ে বেশ-খানিক টানাহেঁচড়া চলতে থাকবে। শেষ পর্বন্ত নাবালক নবাবের কে অভিভাবক হবেন—তিনি না বুব্ববেগম, না আর-কোনো পুরুষ আত্মীয়? গভর্নর-সাহেব কাশিমবাজারেরকুঠিতে পা দিতেই দেখতে পেলেন, তাঁর টেব্‌লে নিত্য নতুন ফল মিষ্টি মেওয়ার ছড়াছড়ি। সে-সব যেমনই বিচিত্র, তেমনই দুষ্প্রাপ্য দুর্মূল্য। সবই মুন্নীবেগমের উপহার। দুদিন পরে আবার তাঁর এক বিশ্বস্ত খোজা এসে দরবারখরচের নাম করে দেড় লাখ টাকা হেস্টিংসের হাতে তুলে দিলেন। হেস্টিংস ওটা না নিলেই ভালো করতেন। ভবিষ্যতে

ওর জন্যে তাঁকে অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু নেওয়া-টাই ছিল তখনকার রেওয়াজ, না-নেওয়াটা ছিল স্রেফ বেয়াদপি। ক্লাইভ প্রভৃতি পূর্বগামী মহাজনেরা সবাই ঐ রীতি অনুসরণ করে গেছেন।

সে যাই হোক, সকলেই দেখতে পেলেন বব্বুবেগম হটে গেলেন। মুন্নীবেগমই শেষ পর্যন্ত নবাব মোবারকউদ্দৌলার অভি-ভাবক নিযুক্ত হয়েছেন। হেস্টিংস তার অন্যরকম কারণ দর্শাবার চেষ্টা করে আমতা আমতা না করলে ভালো করতেন। আসল ব্যাপার ছিল, ক্লাইভ যে-কারণে মীরজাফরকে বাংলার উপযুক্ত নবাব বলে মনে করেছিলেন, ঠিক সেই কারণেই যে হেস্টিংসও মুন্নীবেগমকে নবাবের যোগ্য অভিভাবক বলে মনে করেছিলেন। উভয়েই ইংরেজদের একান্ত অনুগত, কার্যসিদ্ধির পরম সহায়ক। উত্তরকালে দেখা গিয়াছিল, হেস্টিংস একটুও ভুল করেননি। মুন্নী-বেগম প্রতি পদে স্বামীর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলেছিলেন। তিনি ইংরেজদের এতই সাহায্য করেছিলেন যে, তাঁর ডাকনাম হয়ে গিয়েছিল—কোম্পানীর মা।

কিন্তু স্ত্রীলোক হাজার বুদ্ধিমতী হলেও বাইরের কাজ চালা-নোর দরুন এদেশে পুরুষ মানুষের দরকার হয়ই হয়। তাই-মহারাজা মহারাজা নন্দকুমারের বাইশ বছরের ছেলে রাজা গুরু-দাসকে হেস্টিংস নবাববাড়ির খাজাঞ্চি আর সরকারের পদে বসিয়ে দিলেন। পান সুপারী খেলাত ইত্যাদি দিয়ে তাঁকে ঐ-পদে অভিষিক্ত করে নেওয়া হল। তাঁর সঙ্গে রইলেন তাঁর ভগ্নীপতি জগচ্চন্দ্র নায়েব হয়ে। নন্দকুমারের ছেলেকে হেস্টিংস ভালো ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট দিলেও কার্যত গুরুদাস ছিলেন একটি অল্পবুদ্ধি নিরীহ অকর্মণ্য ব্যক্তি।

কমিটি অভ সার্কিট তাঁকে চাকরি দিতে রাজি হন না। তুই করিস নি তো বাপ করেছে—এই সনাতন নীতি-অনুসারে তাঁরা

গুরুদাসের বিরুদ্ধে নন্দকুমারের যাবতীয় কেচ্ছা গাইতে শুরু করে দিলেন।

হেস্‌টিংস তো সববাইকার কাছে ডিরেক্টরদের গোপন নির্দেশ প্রকাশ করে দিতে পারেন্ না। রেজা খাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষীসাবুদ যোগাড় করার কাজে নন্দকুমারকে লাগানো আর তাঁকে তার জন্যে একটা জোলো রকমের বখশিয় দেবার যে কথা ডিরেক্টররা লিখেছিলেন সেটাও তো ব্যক্ত করা চলে না। তাই হেস্‌টিংস নন্দকুমার আর তার ঝাড়ের সবাইকার রেজা খাঁর সঙ্গে প্রবল বিরোধের কথা তুলে খানিকটা বাজে বকে গেলেন। কিন্তু তাতে কমিটিকে সামলানো গেল না। নিতান্ত গভর্নরের মানরক্ষার দরুনই তাঁরা শেষ পর্যন্ত হেস্‌টিংসের প্রস্তাবে সম্মত হয়ে গিয়েছিলেন। মুন্নীবেগমের বেলায় তাঁরা কিন্তু সবাই একমত হয়ে হেস্‌টিংসের কথা মেনে নিয়েছিলেন।

তারপর কাজ খুব সোজা হয়ে গেল। প্রথমেই খালসা, অর্থাৎ রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টের হেড্ অফিস আর সরকারী খাচাঞ্চিখানা কোলকাতায় চালান করে দেওয়া হল। সুবে বাংলার সিন্দুকের চাবিকাঠিই যখন ইংরেজদের হাতে তখন সিন্দুকটাকে নিজেদের কাছে না রেখে মুর্শিদাবাদে ফেলে রাখার কোনো মানে হয় না। তার পরেই মুর্শিদাবাদ আর পাটনার রেভিনিউ বোর্ড দুটো তুলে দেওয়া হল। সমস্ত সুবার দরুন রেভিনিউ বোর্ডে বসতে চলল কোলকাতায়। কাউনসিলের সমস্ত সদস্যই তার মেম্বর রইলেন।

এর পর হেস্‌টিংস খোদ নবাব-বাহাদুরকে নিয়ে পড়লেন। আয় বাড়াতে না পারলে ব্যয়সংকোচ করে ডাইনে বাঁয়ের অঙ্ক মেলানোর রীতিটা এক বেআক্কেলে বেহিসেবী ছাড়া অন্য সবাইকারই জানা কথা। হেস্‌টিংস সেই চেষ্টাতেই লাগলেন। ক্লাইভ যখন হিন্দুস্থানের বাদশা শা আমলের হাত থেকে মাথা পেতে দেওয়ানি-সনদ গ্রহণ করেছিলেন তখন নবাব নজমলদ্দৌলার

সঙ্গে কোম্পানী বাহাদুরের কড়ার হয়েছিল যতদিন আকাশে চন্দ্র-সূর্য উদয় হবে ততদিন নিজামত রক্ষার্থে সুবে বাংলার রাজস্ব থেকে সুবেদারদের পুরুষানুক্রমে কোম্পানী বছর বছর তিপ্পান্ন লাখ করে টাকা দিয়ে যাবেন। সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের নামে শপথ খেয়ে লর্ড ক্লাইভ লিখে দিয়েছিলেন সে প্রতিজ্ঞা কখনো ভঙ্গ হবে না। কিন্তু দেবতাদের নামে উৎসর্গ করা দ্রব্য যখন মানুষ আত্মসাৎ করে তখন যেমন তাঁরা কোনো নালিশ-অভিযোগ করেন না, তেমনি ঈশ্বরের নামে দিব্যি দেওয়া শপথও ভঙ্গ করলে তিনিও মুখ ফুটে কিছু বলেন না। চন্দ্র-সূর্যও আকাশ থেকে খসে পড়ে না। নবাবের প্রাপ্য তিপ্পান্ন লাখ কমতে কমতে বাৎসরিক বত্রিশ লাখে দাঁড় করানো হয়েছিল। হেস্‌টিংস সেটাকে অর্ধেক ষোল লাখে, দাঁড় করাতে উদ্যত হলেন।

হিসেবী ডিরেক্টররাই অবশ্য আগের থেকে সেই নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু অংকটা এমনই কমের দিকে যে, ইংরেজদের অমন হিতৈষী যে মুন্নীবেগম তিনিও পর্দার আড়াল থেকে উঁচু গলাতেই তার প্রতিবাদ করতে লেগে গেলেন। তাই তখনকার মতো কথাটা চাপা পড়ে গেল। কিন্তু ঐ হিড়িকে হেস্‌টিংস নিজামতের অনেকটা ভার নবাবের কাঁধ থেকে লাঘব করে ইংরেজ-দের কাঁধে তুলে দিলেন। মহম্মদ রেজা খাঁকেতো নায়েব-নাজিমের পদ থেকে আগেই সরানো হয়েছে। আর কাউকে ঐ পদে বসানো হল না। ইংরেজরা নিজেরাই নিজামতের সব কাজ চালাবার উদ্যোগ করতে লাগলেন। নবাবের দৌড় অবশেষে তাঁর বাড়ির হাতার মধ্যেই আবদ্ধ হয়ে পড়ল।

রকমসকম দেখে নবাবের মন্ত্রণাদাতারা তাঁকে পরামর্শ দিলেন তিনি যেন ওসবের প্রতিবাদে নবাবিতে ইস্তফা দিয়ে কোলকাতাতে গিয়ে সেইখানেই কোথাও নিরিবিলিতে বসবাস করতে থাকেন। ইংরেজরা তাঁকে একটা পেন্‌সন নিশ্চয়ই দিয়ে যাবেন। বব্বু বেগমও

ঐ দিকে চলেছিলেন। কিন্তু মুন্নীবেগম ঐসব শলা-পরামর্শ শোনবামাত্র বাতিল করেদিলেন। হেস্টিংস দুই বেগমকে একত্র করে নানা সদুপদেশ দিতে লাগলেন। তখনকার মতো তাঁরা অবশ্য খানিকটা ঠাণ্ডা হলেও হেস্টিংস লিখছেন, উভয়ের মধ্যে সদ্ভাব-স্থাপন তিনি একটুও করে তুলতে পারেন নি। দেওয়ানি আর নিজামতি দু'রকম কাজেরই ভার হাতে নিতে পারায় ইংরেজরাই প্রকৃতপক্ষে বাংলামুল্লুকের মালিক হয়ে বসলেন।

হেস্টিংস ডিরেক্টরদের মাথায় বেনেবুদ্ধির জায়গায় খানিকটা করে পোলিটিকল বুদ্ধি চালাবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু দেওয়ানগিরি করা মানে যে কি তা তো তাঁরা স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের ধারণায় দেওয়ানি বলতে তাঁরা বোঝেন রাজস্ব আদায় আর তার বিলিবণ্টনের সুব্যবস্থা করা। সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত করা, তাদের কাজ বুঝে নেওয়া, বিচার-ব্যবস্থা করা, দেশের শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা, দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন—অর্থাৎ এক কথায় অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালানো—দেওয়ানের কর্ম নয়। ওসব নবাব-বাহাদুর আর তাঁর মন্ত্রিবর্গের কর্তব্য।

কিন্তু কান টানলে যেমন তার সঙ্গে মাথাটাও আপনা হতেই এসে পড়ে, তেমনি ভালো করে দেওয়ানি চালাতে হলে তার সঙ্গে দেশের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালানোও অনেকটা হাতে এসে পড়ে, বিশেষ যেখানে নবাব আর নবাব নন, কাঠের পুতুল মাত্র। সে-কথা ডিরেক্টররা না বুঝলেও কোম্পানীর কর্মচারীরা একটু একটু করে বুঝতে আরম্ভ করেছেন। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা, সুবিচার না থাকলে যে রাজস্ব আদায়ে ব্যাঘাত ঘটতে ঘটতে সেটা শেষে বন্ধ হয়ে যায়, ব্যবসা-বাণিজ্যও ভালো চলে না, একথা হেস্টিংস মর্মে মর্মে বুঝতেন।

তাই ডিরেক্টররা যাই বলুন না কেন, হেস্‌টিংস আস্তে আস্তে অ্যাডমিনিসট্রেশনে হাত লাগাতে শুরু করে দিলেন। সুবিধা ছিল নবাব তখন নিতান্ত ছেলেমানুষ, তাঁর অভিভাবক মুন্নীবেগম তো মনে প্রাণে ইংরেজদের সপক্ষে। আর তাঁদের নিজেদের ছিল গায়ের জোর। সুতরাং তখন অ্যাডমিনিস্‌ট্রেশনকে অবহেলা করলে ইংরেজরা ঐ পর্যন্ত যা করেছেন তা সবই পণ্ডশ্রম হয়ে দাঁড়াত। যা হাতের মুঠোয় এসেছে তাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সবাইকে পাততাড়ি গুটিয়ে দেশে ফিরে যেতে হত। কিন্তু দেশে ফিরে গেলে সেখানে শ্রীবৃদ্ধির ভরসা কি আছে ?

তাই জমিজমার বিলিবন্দোবস্ত একরকম করে ফেলে হেস্‌টিংস বিচার-ব্যবস্থার দিকে মন দিলেন। কিন্তু ঐ দিক দিয়ে হেস্‌টিংস কতটা কি করে তুলতে পেরেছিলেন সেটা বলার আগে তার পূর্ব ইতিহাস একটু বলে নিতে হয়। তবে সেটা খুবই সংক্ষেপে। বেশি বলতে গেলে এ প্রসঙ্গ যাঁরা পাঠ করবেন তাঁদের ধৈর্য নষ্ট হয়ে যাবে সে আশঙ্কা আছে।

লেখাপড়া না করেও রাজতন্ত্রে মহাকুশলী আকবর বাদশা তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের সুবাদার বা গভর্নররা যাতে অতি বাড় বেড়ে উঠে কোনো উলটো-পুলটো কাণ্ড ঘটাতে না-পারেন তার দরুন তিনি প্রত্যেক প্রদেশের সুবাদার বা নাজিম নিয়োগ করে সঙ্গে সঙ্গে একজন দেওয়ানকে তাঁর সঙ্গে লেজুড় জুড়ে দিতেন। সুবাদার কি দেওয়ান কারো উপর কারো কর্তৃত্ব ছিল না, তুজনেই বাদশার ভৃত্য, বাদশারই কাছে কাজের জন্যে দায়ী।

বাহ্যত দেওয়ানদের কাজ শুধু রাজস্ব আদায় আর ভাগ বাঁটোয়ারা করা। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাঁর কাজ ছিল সুবাদারের প্রত্যেকটি কাজের উপর দৃষ্টি রাখা। একটু কিছু অঘটন ঘটার সূত্রপাত হচ্ছে দেখলেই সেটা বাদশাকে জানানো তাঁর ছিল কর্তব্যকর্ম। সুবাদার কিংবা নাজিম-বাহাতুরের কাজ ছিল

দেশের শান্তি রক্ষা করা, অনাচার-অত্যাচারের হাত থেকে প্রজাদের বাঁচানো, বাইরের শত্রুদের আক্রমণ থেকে দেশকে মুক্ত রাখা। কিন্তু সেই সঙ্গে দেওয়ান-বাহাদুরের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রেখে বাদশাহকে সব জানান্ দেওয়াও তাঁর আর একটা কাজ ছিল। ফলে, দেশের দুই প্রধান দুদিক থেকে কল টেপার দরুণ দাঁড়িপাল্লার দু-দিককার ভাব সব সময় সমান থাকত।

রাজকর্মের যেমন বড়ো দুটো বিভাগ ছিল—নিজামত আর দেওয়ানি—বিচার-ব্যাপারেও তেম্নি দুটো ভাগ ছিল—ফৌজদারি আর দেওয়ানি। দেওয়ানি আদালত বসিয়ে দেওয়ানি মামলার বিচার চালানো ছিল দেওয়ানের হাতে, আবার ফৌজদারি আদালত বসিয়ে ফৌজদারি মামলার বিচার-ব্যবস্থা ছিল সুবাদার বা নিজামের হাতে। দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রত্যেকই তাঁর নিজের কর্মচারী বসিয়ে দিতেন দু-রকমেই মামলা-বিচারের দরুন। আপিল একটা ছিল। তার শুনানি হত স্বয়ং কর্তাদের কাছে—সুবাদার কি দেওয়ানের কাছে। পরগণার ভিতরকার ছোটোখাটো মালিমামলা জমিদাররাই নিষ্পন্ন করে দিতেন। আইনতঃ অবশ্য তা করার অধিকার জমিদারদের ছিল না, কিন্তু ওটা বহুকালের প্রথা বলে কেউ তাতে কোনো আপত্তি তুলত না।

বাদশা আওরংজীবের মৃত্যুকাল পর্যন্ত, ঐ ১৭০৭ সালের গোড়ার দিক পর্যন্ত, ঐ ব্যবস্থা মোটের উপর একরকম মন্দ চলেনি। কিন্তু তার অল্প-কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল, অত বড়ো মোগল সাম্রাজ্যে চারদিক থেকে ভাঙন ধরতে আরম্ভ করেছে। ভাঙার ধাক্কায় তা পতনের দিকে তরতর করে গড়িয়ে চলল। যাঁরা সুবাদার ছিলেন তাঁরা গায়ের জোরেই নিজের নিজের প্রদেশে স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করতে লেগে গেলেন। নিজেদের বংশের থেকেই কাউকে তাঁরা তাঁদের পরবর্তী সুবাদার মনোনীত করে

যেতেন। মুখে বাদশাকে মান্য দেখানো ছাড়া সুবাদাররা তার আর কোনো তোয়াক্কা রাখতেন না। সুবে বাংলায় (বাংলা -বিহার-উড়িষ্যা) মুর্শিদকুলি খাঁর নবাবি আমল থেকেই ঐ কাণ্ড চলতে থাকে সুতরাং সেই থেকেই দেওয়ানের পদও উঠে যায়। তাই নিজামত আর দেওয়ানিতে কোনো প্রভেদ ছিল না। দেওয়ানি আর ফৌজদারি মামলাও এক হয়ে গেল। একই লোকেদের কাছে অর্থাৎ কাজীদের কাছে দু-রকমেরই মামলার বিচার হত। আপিলেরও শুনানি হত একই ব্যক্তি অর্থাৎ নবাব-বাহাদুরের নিজামতে।

বাদশা শা আলম ইংরেজদের হাতে দেওয়ানি সনদ সঁপে দিতে দেওয়ানি আর নিজামত দুই-ই আবার ভিন্ন হয়ে পড়ল। কিন্তু আলাদা হয়েও আলাদা হল না। কারণটা আগেই বলা হয়েছে। দেওয়ানির কাজ নিজেদের হাতে না নিয়ে ইংরেজরা সেটা এক নায়েব অর্থাৎ মহম্মদ রেজা খাঁর হাতেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। ওদিকে ইংরেজদের পেড়াপিড়িতে নবাব নজমউদ্দৌলাও আবার ঐ রেজা খাঁকেই নায়েব-নাজিম করে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন সুতরাং অন্য সবরকমের সঙ্গে দেশের বিচার-ব্যবস্থাও পূর্বের মতোই রয়ে গেল।

এক সময় লর্ড ক্লাইভ দেওয়ানি আর নিজামতের ঐ ভুয়ো প্রভেদ দূর করার জন্যে সুবে বাংলার সুবাদারিও নিজের হাতে নেবার চেষ্টা করেছিলেন। পাকে-প্রকারে তিনি জানতে পেরেছিলেন বাদশা শা আলমের তাতে মত আছে। কিন্তু মত হল না বৃটিশ প্রাইমমিনিস্টারের। তিনি ক্লাইভের ঐ-সম্পর্কে গোপন ডেসপ্যাচের জবাবে হ্যাঁ না কিছুই বললেন না। যদিও তখন থেকে কার্যভার একই নায়েবের হাতে পড়ায় দেওয়ানি আর নিজামতে প্রভেদ বড়ো-একটা দেখা না গেলেও তবু যা প্রকট হয়ে উঠতে লাগল সেটা হচ্ছে ধলা-কালার প্রভেদ।

দিশি বিচার-ব্যবস্থার প্রায় নলচে খোল বদলে ফেললেন ওয়ারেন হেস্‌টিংস। কাজী-সাহেবেরা ঘরে বসেই গোপনে মামলার বিচার করতেন। কালেভদ্রে নিতান্ত মর্জি গেলে দয়া করে এক-আধবার কাছারিতে গিয়ে বসতেন। সুতরাং শুনানীর আগেই মামলা খতম। সরকার থেকে তাঁদের নিয়মিত মাইনেরও কোনো বরাদ্দ ছিল না। ফৌজদারি কেসে যা জরিমানা আদায় হত আর দেওয়ানি মামলা জিতলে চৌথ বলে যে টাকা ধরে দিতে হত, তাই থেকেই তাঁদের জীবিকা-নির্বাহ হত। আসামীদের দোষ সাব্যস্ত হলে তাকে তো জরিমানা একটা দিতেই হত, কিন্তু ফরিয়াদি জিতে গেলে তাকেও জিতে যাওয়ার দরুনই কাজীর দুয়োরে একটা সিন্নি চড়িয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হত। দেওয়ানি মামলায় যার জিত হত তাকেও উদ্ধারকরা সম্পত্তির সিকি অংশের মূল্য বা চৌথ ধরে দিয়ে তবেই বাড়ি ফেরার হুকুম পেতে হত।

হিন্দু প্রজাদের আইন-কানুন শাস্ত্রের বিধিনিষেধ মুসলমান বিচার-কর্তা বুঝতেনও না, মানতেও চাইতেন না। মুসলমান প্রবর্তিত আইনকানুনেই তাদের বিচার করা হত। সে-সব রীতিনীতির স্পষ্ট একটা নজির লেখাজোখায় না থাকার দরুন বিচারকদের যিনি যা ভালো বুঝতেন তিনি সেইরকমই বিচার করতেন। কাজীর বিচার কথাটা বঙ্গভাষায় তো প্রমাদবাক্য হয়ে গেছে। সুতরাং ব্যাখ্যা না দিলেও তার মানে বুঝতে কারো কষ্ট হবার কথা নয়। রকম-সকম দেখে হিন্দু প্রজারা তাদের মামলাগুলো সালিসিতেই মিটিয়ে নিত। ব্যাপারটা কিছু মন্দ নয় বলে মুসলমানদেরও ক্ষেত্রে ঐ পন্থা অবলম্বন করবায় জন্যে ইংরেজ কর্তারা নায়েব-দেওয়ানকে একবার লিখে পাঠিয়েছিলেন। প্রত্যুত্তরে রেজা খাঁ জানিয়ে দিয়েছিলেন ওটা মুসলমান ধর্মের বিরুদ্ধে যাবে। এটা গেল দেওয়ানি মামলার কথা। ফৌজদারি

মামলায় কাজীর হাত থেকে কারো নিষ্কৃতি ছিল না। মুসলমানী ফৌজদারি আইন তখন সমস্ত দেশেরই ফৌজদারি আইন।

জরিমানা চৌথে প্রজাদের কারো লাভ না হলেও বিচারকদের প্রচুর লাভ হত। অন্যথায় তাঁদের আহার বন্ধ। তাই প্রায় সমস্ত ফৌজদারি মামলায় জরিমানাই আস্তে আস্তে সবরকম কসুরের একমাত্র দণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এমন কি যেখানে প্রাণদণ্ড লঘুদণ্ড বলে বিবেচ্য সেখানেও জরিমানা দিয়ে অপরাধী পরিত্রাণ পেয়ে যেত। দুষ্কৃতেরা দেখল, দুষ্কর্ম করলে যা লাভ, ধরা পড়ে তার জন্যে যা শাস্তি পেতে হয়, সেটা তুলনায় নিতান্ত নগণ্য দাঁড়ায়। ফলে চুরি ডাকাতি, রাহাজানি, খুন-খারাপি জিয়মেট্রিক প্রোগ্রেশনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকল। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও মনে রাখতে হবে, এক রকম শাসন-ব্যবস্থা থেকে অন্য আর-এক-রকমের শাসনব্যবস্থা কায়েম না হওয়া পর্যন্ত দৌরাত্ম্যের পরিমাণ বেড়ে যায়ই। তাতে কাজী-সাহেবদের কোনো হাত ছিল না। সুবে বাংলায় ইংরেজরাই তো তখন মোগল রাজত্বের বনেদ্ ভেঙে দিয়েছেন অথচ নিজেদের শাসন সে-জায়গায় পাকা করে বসাতে পারেন নি। ফল যে তার বিষময় হবে তা বলাই বাহুল্য।

যাক, ও-সম্বন্ধে কথা না বাড়িয়ে, এদেশের বিচার-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বৃটিশ পারলামেণ্ট যে তদন্ত-কমিটি বসিয়েছিলেন সেই কমিটিরই রিপোর্ট (১৭৭৩ সালের) থেকে দু-একটা কথা তুলে ধরা হচ্ছে ঃ যদিও ঐ সময় (১৭৬৫-৭২) সুবে বাংলার আদালত একরকমের থাকলেও সেটা স্বৈরাচারেরই উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং সেটা ন্যায়বিচারের নাম করে প্রকৃতপক্ষে প্রজাদের উপর জুলুমবাজিরই একটা কল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঐ সময়কার বিখ্যাত ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন তাঁর সিয়রউল্-মুতাক্ষরীণ গ্রন্থে লিখে রেখে গেছেন ঃ পরমেশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ যে, তিনি দিশি লোকদের হাত থেকে ফৌজদারি তুলে সেটা ইংরেজদের তাঁবে

পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। প্রার্থনা করি, পরমেশ্বর যেন সর্ববিষয়েই ঐরকম করে এদেশের কল্যাণ বিধান করেন। একবার নয়, গোলাম হোসেন বার বার ঐ একই কথার উল্লেখ করে গেছেন।

কল্যাণের সূচনা কিন্তু ক্লাইভ করেন নি। করেছিলেন যে ওয়ারেন হেসটিংস, সে-কথা সকলকেই মানতে হবে। মুর্শিদাবাদেই বসে তিনি দেশের বিচার-ব্যবস্থার বড়োরকমের সংস্কারের একটা স্কীম খাড়া করে ফেললেন। সেটা একেবারে নিখুঁত না হলেও বেশ কাজের স্কীম হয়েছিল। পরবর্তীকালে ওরই কাঠামোর উপর ভিত্তি করে সমস্ত ভারতবর্ষেরই বিচার-ব্যবস্থা ইংরেজ আমলের শেষ পর্যন্তই এদেশে চালু ছিল! অবশ্য মাঝে মাঝে সময়োপযোগী করবার জন্যে তার ডালপালায় একটু যোগবিয়োগ করা হয়েছিল। বস্তুতঃ দেশের বিচার পদ্ধতি এখনো যা চলেছে তা মোটের উপর ঐ একই ধারায়।

সংক্ষেপে ঐ স্কীম ছিল এইরকম: মফঃস্বলের প্রত্যেকটি জেলায় একটি করে দেওয়ানি আর একটি করে ফৌজদারি আদালত বসবে। দেওয়ানি আদালতের জজ থাকবেন জেলার ইংরেজ কলেক্টর। তাঁর সঙ্গে থাকবেন তাঁর দিশি দেওয়ান আর অন্যান্য দিশি কর্মচারীরা। ফৌজদারী আদালতের কাজ আপাতত কাজীরাই চালিয়ে যাবেন মুফতি মৌলভীদের সাহায্যে। কিন্তু বিচারের সময় কলেক্টর-সাহেব সেখানে উপস্থিত থেকে আগাগোড়া সব দেখাশুনো করবেন। ফৌজদারি ব্যাপার নিজামতের অন্তর্ভুক্ত। হেসটিংস তাকে একরকম জোর করেই দখল করে বসায় তার উপর যতটা পারেন দিশি ছাপ মেরে রেখেছিলেন। কিন্তু অবিচার যাতে না হতে পারে তারো ব্যবস্থা করে রাখলেন। কোন্ কোন্ মামলা দেওয়ানিতে যাবে আর কোন্ কোন্ মামলা ফৌজদারীতে যাবে তারও একটা স্পষ্ট নির্দেশ স্কীমে দেওয়া রইল।

স্থির হল, কলেক্টররা নিয়ম করে হপ্তায় দু-বার করে প্রকাশ্য আদালতে বসে কাছারি করবেন। কাজীদের সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম। কি দেওয়ানি আর কি ফৌজদারি প্রত্যেকটি মামলার রায় সমেত সমস্ত বিবরণ নথিভুক্ত করতে হবে, আগের মতো শুধু মাথায় মাথায় রেখে দিলেই চলবে না। কাছারি ঘরের সামনে একটা করে বড়ো বাক্স টাঙানো থাকবে। তার চাবি থাকবে স্বয়ং কলেক্টর-সাহেবের হাতে। প্রজাদের যার যা নালিশ তা কি দেওয়ানি আর কি ফৌজদারি তার আর্জি তারা ঐ বাক্সে ফেলে দিয়ে যেতে পারবে। কাছারির দিন কলেক্টর-সাহেব নিজে চাবি খুলে সে সব আর্জি বাক্স থেকে বের করে দেওয়ানদের দিইয়ে পড়িয়ে নেবেন। তারপর ফৌজদারি আর্জি ফৌজদারিতে পাঠিয়ে দেওয়ানি আর্জি নিজের আদালতের নথিতে রেখে দেবেন।

কিন্তু কেউ মিথ্যে মামলা করলে, কি নিতান্ত তুচ্ছ কারণে মামলা আনলে তার জন্যে তাকে শাস্তি দেবারও একটা ব্যবস্থা রইল।

সবচেয়ে বড়ো নিয়ম হল যে, দু-রকম আদালতেরই বিচারক থেকে সামান্য পোয়াদা পর্যন্ত সবাই মাস মাস নিয়ম মতো সরকারী তবিল থেকে একটা মাইনে পেয়ে যাবেন। চৌথ কি জরিমানার উপর তাঁদের আর নির্ভর করতে হবে না। চৌথ তো একেবারেই উঠিয়ে দেওয়া হল ; গুরু পাপে জরিমানার মতো লঘু দণ্ড দেওয়াও বন্ধ হয়ে গেল।

শহর কোলকাতাতেও দুটো বড়ো আদালত বসাবার ব্যবস্থা করা হল। একটা সদর দেওয়ানি আর একটা সদর নিজামত আদালত। মফঃস্বল থেকে পাঁচশো টাকার উপরের সব দেওয়ানি মামলার আপিল চলবে সদর দেওয়ানি আদালতে। সদর নিজামত আদালত মফঃস্বলের যাবতীয় ফৌজদারি মামলার নথিপত্র আনিয়ে নিয়ে আবশ্যক বোধ করলে রায় সংশোধন করে

দিতে পারবেন। প্রাণদণ্ড সদর নিজামত আদালত মঞ্জুর না করলে গ্রাহ্য হবে না। দু-মাস অন্তর মফঃস্বল থেকে সব দেওয়ানি আর ফৌজদারি মামলার কাগজপত্রের সারচুম্বক সদরে পাঠানোর নিয়ম করে দেওয়া হল।

স্থির হল, নতুন বছরের (১৭৭৩ সালের) গোড়া থেকেই ঐ স্কীম চালু করা হবে।

ইতিমধ্যে কমিটি অভ সারকিট রাজসাহী জেলার সমস্ত পরগণাগুলো একে একে বিলি করে ফেললেন। তখন রাজশাহী জেলার মধ্যে গঙ্গার ওপারের সমস্ত উত্তরবঙ্গ আর পূর্ববঙ্গেরও অনেকটা অংশ পড়ত। কাজ সেরে কমিটি গেলেন একবারে পূর্ব দিকে। হেস্‌টিংস ফিরে গেলেন কোলকাতায়।

রাজধানী কলকাতা।

রাজধানী নয় তো কি? যেখানে সমস্ত সুবার খাচাঞ্চিখানা উঠে গেল, খালসা নিয়ে গিয়ে ফেলা হল, দু'-দুটো বড়ো আদালত বসল, সিক্কা টাকা চালানোর জন্যে এক জবর ট্যাঁকশালও বসতে চলেছে—এক কথায় যেখানে দেশের শাসনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হতে চলল, তাকে রাজধানী না-বলে আর কি বলা চলে? যদিও সুবে বাংলার নবাব বাহাদুর তখনো মুর্শিদাবাদেই বসে তাঁর ছেলে-মানুষি দরবার চালিয়ে যাচ্ছেন বটে, কিন্তু তা হলেও সে-জায়গাকে আর রাজধানী বলা চলে না ইংরেজদের প্রতাপের প্রতীক কলকাতা শহরই প্রকৃতপক্ষে রাজধানী দাঁড়িয়ে গেল। হেস্‌টিংস লিখে গেছেন, এক দিন এই কলকাতা শহরই এশিয় মহাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ নগরী বলে বিখ্যাত হয়ে পড়বে। পড়েও ছিল। কিন্তু ইংরেজরাই তাকে স্বহস্তে ভেঙে দিয়ে গিয়েছিলেন। দিল্লীতে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যাবার পর তাঁরা কিন্তু নিজেরাও আর বেশি দিন এদেশে টেঁকেন নি। তাঁরা একা নন; অনেক রাজাবাদশা দিল্লিতে রাজধানী ফেঁদে কর্পূরের মতো উবে গিয়েছিলেন।

যাই হোক, খালাস দপ্তর কলকাতায় উঠে আসত তাকে কাউনসিল হাউসের একাংশে বসিয়ে দেওয়া হল। নবাব আলী-বর্দী খাঁর পরম বিশ্বাসভাজন মন্ত্রী রাজা জানকীরামের পুত্র দুর্লভ রাম। দুর্লভরামেরই উপযুক্ত পুত্র রাজা রাজবল্লভ। ঢাকার বিখ্যাত রাজা রাজবল্লভ নন, এঁদের আদি নিবাস চুঁচুড়ায়, কৌলিক উপাধি সোম। এঁরা তিন পুরুষে সরকারী চাকুরে। হেস্‌টিংস তাঁকেই রায়রায়ান, অর্থাৎ আজকলকার ভাষায় রেভিনিল

ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী করে বসিয়ে দিলেন। মাইনে হল মাস গেলে পাঁচ হাজার টাকা রাজরাজড়ার উপযুক্ত মর্যাদা বটে।

তখনকার দিনে রাজস্ব সংক্রান্ত যাবতীয় হিসেবপত্র বাংলাতেই রাখা হত। জেলায় জেলায় কলেক্টরী দপ্তরেও ঐ ভাষাতেই হিসেব রাখার পদ্ধতি ছিল। জমিদারী সেরেস্তায় তো বটেই। সেখানে ইংরিজি কি ফার্সী লিখে কি কাজ হবে। মফঃস্বলেব কলেক্টার সেরেস্তা থেকে যেসব হিসেবপত্র খালসা দপ্তরে পাঠানো হত তাও বদ ফার্সী মেশানো বাংলায় লেখা। তার মধ্যে কোথায় কি গলদ আছে সেটা চট করে ধরে ফেলবার জন্যে একজন পাকা মাথাওয়ালা বাঙালীর বিশেষ দরকার ছিল কারণ, ঐসব হিসেব যেমনি প্যাঁচালো, তার ভাষাও ঠিক তেমনিই বিদঘুটে। রাজ-বল্লভের মাথা ওসব বিষয়ে বিলকুল সাফ। তাঁকে রায়রায়ানের পদে বসিয়ে ইংরেজদের একটুও ঠকতে হয় নি। খালসা দপ্তরের নথিপত্র ঠিক রাখবার জন্যে হেস্‌টিংস তাঁর এক বিশেষ প্রিয়পাত্র ছোকরা সিভিলিয়ন আঠারো বয়সের আলেকজাণ্ডার এলিয়টকে সেখানকার সুপারিনটেণ্ডেন্ট করে দিলেন। ঐ অত কম বয়েসেই তিনি নাকি দিশি ভাষায় বেশ দড় হয়ে উঠেছিলেন। অল্প বয়েসেই তাঁর মৃত্যু ঘটায় তাঁর গুণপনার বিশেষ কিছু পরিচিয় তিনি রেখে যেতে পারেন নি। সুতরাং তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় যে ঠিক কতটা ছিল তা এখন নিশ্চয় করে বলা শক্ত। তবে এ কথা ঠিক যে, এলিয়ট বিলেতের এক খানদানী ঘরের ছেলে। কলকাতার ইংরেজ সমাজে তারই জোরে তাঁর প্রতিষ্ঠা। বাংলার ইতিহাসে তাঁর একটু নাম রয়ে গেছে এই কারণে যে, তিনি নন্দ-কুমারের বিচারের সময় দোভাষীর কাজ করেছিলেন।

ইতিমধ্যে বাংলা মুল্লুকের প্রায় সবকটা পরগণাই এক এক করে বিলি বন্দোবস্ত হয়ে গেল। খালসা দপ্তরের কাজ কলের মতোই চলতে লাগল। এমনি নির্ঝঞ্ঝাটে যে, তাই দেখে হেস্‌টিংস

নিজেই অবাক। তবে আদায়ী রাজস্বের পরিমাণ যে কমে গিয়েছিল সেটা অবশ্য অন্য অনেক কারণে।

মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠদের বিষয়কর্ম প্রায় লোপ পেতে বসল। তাঁরাই তো এতদিন ধরে সুবে বাংলার স্টেটব্যাঙ্কার্সের পদ অলংকৃত করে এসেছেন। আর হতো অঢেল টাকা থাকায় পলিটিক্সের ওঠবোস খেলাতে তাঁরা নব সময়ই বেশ বড়োগোছের পার্ট নিয়েছেন। সারা সুবার রাজস্ব আদায় হয়ে তাঁদেরই সিন্দুকে জমা পড়ত। অন্য আরো পাঁচ রকমের লেনদেনের কারবারে তাঁদের হৌস অষ্টপ্রহর সরগরম। কলকাতায় সরকারী খাচাঞ্চিখানা আর খালসা দপ্তর উঠে যেতে সেসব একে একে নিবো-নিবো হয়ে পড়তে লাগল। অবশেষে শেঠেরা ব্যবসা-বাণিজ্য কমিয়ে এনে জমিদারি নেড়েচেড়ে দিন কাটাতে লাগলেন পুরনো জৌলুষ আর ফিরল না।

কোলকাতায় ট্যাঁকশাল বসতে জগৎশেঠদের আরো ক্ষতি হল। মুর্শিদাবাদের সরকারী ট্যাঁকশাল তাঁদেরই তাঁবে ছিল। লোকদের কাছ থেকে সোনারুপোর তাল কি গহনাগাঁটি নিয়ে তার বদলে ট্যাঁকশালে ছাপা মোহর-টাকা ধরে দিতেন। তাতে তাঁর বিস্তার টাকা লাভ করতেন। দেশে তখন যে কতরকমের টাকার প্রচলন ছিল তা আর গুণে শেষ করা যায় না। তাদের আকারও যেমন বিচিত্র ওজনও তেমনি রকমারি। সেগুলো ভাঙাবার জন্যে লোকদের জগৎ শেঠদের দ্বারস্থ হতে হত। তাঁরাও সুযোগ উপস্থিত বুঝে বড়ো রকমের বাট্টা নিয়ে দাঁও মারতেন। মুর্শিদাবাদী টাকাটা-সিকেটা না পেলে তো বঙ্গদেশে কাজ চলে না? কোলকাতার ট্যাঁকশাল থেকে একই চেহারার একই ওজনের সমান খাদের সিক্কা টাকা বেরোতে দেখে লোকদের এখন সেই টাকাই পাবার আগ্রহ বেড়ে উটল। তাছাড়া ইংরেজা দেশ থেকে কি চীন থেকে রুপো আনিয়ে টাকা ছাপতেন বলে লোকদের

বিপদের সহায় তাদের সঞ্চিত অলংকারগুলো বেঁচে যেতে লাগল। কালক্রমে ঐ সিক্কা টাকাই ভারতবর্ষের সর্বত্র চালু হয়ে পড়েছিল। আর বৃটিশ আমলের শেষ পর্যন্তই তা এদেশে প্রচলিত ছিল। তার পরেও কিছুদিন চলেছিল।

হেস্‌টিংস দিশি পোদ্দারদের ডাকিয়ে এনে তাদের দিইয়ে কোলকাতায় একটা ব্যাংক খুলিয়ে ফেললেন। ঐ ব্যাঙ্কের এবার একটা করে হৌস সুবে বাংলার প্রায় সমস্ত জেলাতেই বসে গেল। জমিদারেরা তাদের দেয় রাজস্ব ঐসব হৌসে জমা দিতে পারতেন। জমা দিয়ে হৌসের দেওয়া রসিদ কলেক্টরিতে জমা করে দিলেই চলত। হৌস হুণ্ডি কেটে সে-টাকা কোলকাতার খালসায় পাঠিয়ে দিত। তখনকার দারুণ অরাজকতার দিনে ঐ ব্যবস্থা যে কত কাজে লেগেছিল তা আর বলে শেষ করা যায় না। তখন একপাল লোক আর একরাশ অস্ত্রশস্ত্র না করে টাকা কড়ি নিয়ে কেউ-ই একপা নড়তে সাহস করত না। ডাকাতে সব লুঠে নিত।

সেটা যুগ-সন্ধিকাল। সুবে বাংলায় তখন মুসলমানী আমল শেষ হয়ে এসেছে কিন্তু, ইংরেজি আমল প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে নি। ইংরেজরা স্বহস্তে দেশের শাসনভার নিতে ইতস্তত করছেন। ঐ অরাজক অবস্থায় রাজ্যের যত দুর্বৃত্তেরা মাথা চাগিয়ে উঠে পড়ল। তারা মিলে দেশের সর্বত্রই ডাকাতের দল সৃষ্টি করেছিল। পুরানো আমলের যে সব লোক নতুন আমলে জীবিকার কোনো উপায় করতে পারল না তারাও গিয়ে ডাকাতের দলে যোগ দিল। আবার ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে সর্বস্বান্ত হয়েও অনেকেই ডাকাতি ধরেছিল। মোট কথা সব নিয়ে

সে এক ভীষণ অবস্থা। ডাকাতদের শাসনে আনার কেউ ছিল না। ফৌজদার-থানাদারদের নিজেদেরই অবস্থা তখন এমন শোচনীয় যে তাদেরকেই কে দেখে তার ঠিক নেই তো তারা অন্যকে কি দেখবে? জমিদারী এলাকায় শান্তি রক্ষার দায় ছিল

জমিদারদেরই। কিন্তু তাঁরাও তো এক-একটি ডাকাতের সর্দার হয়ে উঠেছেন। বড়ো বড়ো ডাকাতের দল পুষে তাঁরাও বেশ ডাকাতি করে বেড়াতেন।

এক-একটা ডাকাতের দলে পঞ্চাশ-ষাট থেকে চারশো-পাঁচশো পর্যন্ত লোক থাকত। অনেক সময় দলের লোক কমে গেলে ডাকাতেরা গরীব নিরীহ গ্রামবাসীদের ধরে নিয়ে গিয়েও নিজেদের কাজে লাগিয়ে দিত। কাজ সারা হয়ে গেলে তারা আবার নিজের নিজের ঘরে ফিরে যেত। তবে পাকা ডাকাতেরা প্রায় সবাই বংশানুক্রমে সপরিবার ডাকাতি করত। ডাকাতি করা ছাড়া আর কোন নেশা ছিল না। প্রাণের ভয়ে কেউই তাদের কথা প্রকাশ করত না। যদি ক্বচিৎ কখনো কেউ লোভে পড়ে ফাঁস করে দিত তো তার আর রক্ষা ছিল না। শেষ পর্যন্ত কিছুতেই তাকে আর প্রাণে বাঁচতে হত না। এমন কি দেখতে পাওয়া যেত ধরা পড়ে কোনো ডাকাত দীর্ঘকাল দণ্ডভোগ করে বাড়ি ফিরে এসেও সংবাদদাতার উপর ঠিক প্রতিশোধ নিয়েছে।

ডাকাতদের ইষ্টদেবী মা-কালী। লোকমুখে সেই কালীরই নাম হয়ে গেল ডাকাতে কালী। নরবলি তাঁর উপাচার। তাই ঐ সময় বাংলার সব জায়গা থেকেই খুব ধুমধামে নরবলী দেওয়ার খবর পাওয়া যেত। গভীর রাত্রে বলি দিয়ে কপালে রক্তের টিপ পরে মুখে কালিঝুলি মেখে চেহারা আরো বিকট করে মশাল জ্বালিয়ে হাতে লাঠি-সড়কি-তলোয়ার এমন কি কখনো কখনো মুঙ্গেরী গাদা বন্দুকও নিয়ে তারা জলস্থল সর্বত্রই রাহাজানি করতে বেরিয়ে পড়ত। ধনী মধ্যবিত্ত এমন কি গরীব গৃহস্থ বাড়িতেও পড়ে তার সমস্ত লুঠ করে নিয়ে পালাত। কেউ বাধা দিতে গেলে তার আর রক্ষা ছিল না, সঙ্গে-সঙ্গেই প্রাণ যেত। কি ছেলে, কি বুড়ো, কি পুরুষ আর কি মেয়ে, এমনকি খুদে শিশুরাও কেউ তাদের হাত থেকে নিস্তার পেত না। লুটের মাল কম হলে

ডাকাতেরা ভাবত গৃহস্থরা তাঁদের ধনরত্ন দামী দামী জিনিসপত্র নিশ্চয়ই কোথায় লুকিয়ে ফেলেছে। তখন গুপ্তধনের হদিস বলে দেবার জন্যে চলত অত্যাচার উৎপীড়ন। তার চোটেও অনেকেরই প্রাণ যেত। যারা কোনোক্রমে বেঁচে যেত তারা জ্যান্তেমরা হয়ে পড়ে থাকত।

ডাকাতদের আবার দলবৃদ্ধি করেছিল সন্ন্যাসী ফকিরেরা। তারা বছর-বছর পুরীতে তীর্থ করতে যাবার সময় বঙ্গদেশে—বিশেষ করে উত্তরবঙ্গে—মারাত্মক রকমের উৎপাৎ লাগিয়ে দিত। তাদের দলে সচরাচর হাজার খানেকের কম লোক থাকত না। সংখ্যা কখনো কখনো দশ হাজারেরও উপর উঠত। তাদের বেশির ভাগই উলঙ্গ নাগা সন্ন্যাসী। পশ্চিমা গিরিপুরী ভারতী ইত্যাদি দশনামীদের দল। যখন আরা নিজের নিজের কোঠে শান্ত হয়ে বসে থাকত তখন কেউ কেউ দোকানদার আড়তদার কি অন্য আর পাঁচ রকমের ব্যবসাদার। কেউ কেউ আবার ভুঁড়ো পেটে হাত বোলাতে বোলাতে পিঠে তাকিয়া ঠেস দিয়ে জাঁকিয়ে বসে জমিদারগিরিও করতে লেগে যেত। তীর্থগামী সন্ন্যাসীদের প্রজারা তাদের প্রচুর সমীহ করে চলত, প্রাণান্তেও তাদের বিরুদ্ধাচরণ করত না। ওদের হাতে সব খুইয়েও মুখ বন্ধ করে চুপ করে থাকত।

বঙ্কিমবাবু তাঁর দেবীচৌধুরাণী আর আনন্দমঠ গ্রন্থে ডাকাতদের আর ঐ সন্ন্যাসীদের চমৎকার ছবি এঁকেছেন। তাতে ইতিহাসের তথ্য খানিকটা বিকৃত হলেও রোমান্সের ছিটে পড়ায় ইতিহাসের মরা মানুষগুলি জ্বলজ্যান্ত হয়ে চোখের সামনে ভাসতে থাকে। আসলে ডাকাতেরা কেউ কিন্তু রবিন হুডের মতো দুষ্টের দমনকারী আর শিষ্টের পালনকারী ভদ্র দস্যু ছিল না, নিতান্ত ওঁচা রকমের পাকা বদমাস। ভদ্রা-ভদ্র দয়া-দাক্ষিন্য স্নেহ-মমতা তাদের কাছেও ঘেঁসতে পারত না। সন্ন্যাসীদের ধরে-কষে

নিঙড়লেও তার থেকে একফোঁটা ভক্তি বেরোত না। যা বেরোত সেটা নিছক পরস্ব অপহরণের প্রচণ্ড লোভ। ঢের পরবর্তিকালের দেশভক্তির ভাবনা ঐসব কদাচারী ক-অক্ষর-গোমাংস সন্নাসীদের ঘাড়ে চাপিয়ে বঙ্কিমবাবু তাদের বেদান্ত-পড়নেওয়ালা দেশমাতার এক নিষ্কাম সেবকদলের 'সন্তান' সম্প্রদায়ে পরিণত হয়ে গেছেন। তখনকার দিনে সন্ন্যাসীদের কেন, কোনো একজন ভারতবাসীর মাথায় দেশভক্তির কথা উদয় হয় নি। ওসব ভাবনা আসে উনিশ শতাব্দী থেকে, ইংরিজি-বিদ্যা প্রচলনের ফলে। ইউরোপীয়ান ইতিহাস আর পলিটিকল-ফিলজফি পড়ে। বঙ্কিমবাবু সেটাকে খানিক দূর এগিয়েই নিয়ে গিয়ে ফেলেছেন। তখন দেশকে লুঠ করে কি পাওয়া যায় সেই ভাবনা ছাড়া দেশ-সম্বন্ধে অন্য আর-কোনো ভাবনা কারো মাথায় ছিল না।

হেস্টিংস ডাকাতদের শায়েস্তা করার এক অভিনব পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি বেশ বুঝেছিলেন মামুলি আইনকানুন দিয়ে ঐ সব দুর্ধর্ষদের দলটিকে কিছুতেই ঢিট্‌করা যাবে না। তাই তিনি নিয়ম করলেন, ডাকাতেরা ধরা পড়লেই তাদেরকে নিজের নিজের গ্রামে নিয়ে গিয়ে পরিবার-পরিজন আর গ্রামস্থ সবাকার সামনেই গাছে লটকে ফাঁসি দেওয়া হবে। তাদের বাড়ির সবাইকে ধরে ক্রীতদাস হিসেবে অন্যত্র চালান করে দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রামসুদ্ধ সবাইকার পাইকারি জরিমানা। শুধু ধরা পড়লেই নয়, জনরবে কারো ডাকাতি প্রসিদ্ধি থাকলেও ঐ একই ব্যবস্থা। পিনাল কোড ক্রিমিনল প্রোসিজোর কোড এভিডেন্স অ্যাক্ট পড়া ব্যক্তিরা শুনে নাক সিঁটকোবেন জানি। কিন্তু যেমন রোগ তার তেমনি দাওয়াই না হলেই বা চলে কি করে? যেমনি কুকুর তার তেমনি তো মুগুর হওয়া চাই। সেই থেকেই ডাকাতির প্রকোপ হ্রাস হয়ে চলেছিল। লোকের মনেও একটু এদটু করে আইনের ভয় ঢুকতে লাগল। অন্য কিছুতে তা হত কিনা সন্দেহ।

কিন্তু সন্ন্যাসীদের দোরস্ত করা আদবেই অতটা সহজ হয় নি। এমনিতেই তারা অর্থ-সামর্থ তুয়েতেই খুব জোরালো, তার উপর দেশের লোকদের সাধুজন বলে তাদের উপর অসম্ভব ভক্তি থাকায় তাদের জব্দ করা খুবই কঠিন ছিল। দু-চারবার পরগণা-সেপাইদের তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়ে কোনই ফল হয় নি। উলটে তারাই সেপাইদের মেরেধরে ছারখার করে দিয়েছিল। অবশেষে মিলি-টারী ফৌজ থেকে পলটন-সেপাই পাঠাতে তারা ঐ সন্ন্যাসীদের দলের সঙ্গে লড়তে লড়তে তাদের আধমরা করে দিয়েছিল। বেগতিক দেখে তারা সেই যে বঙ্গদেশ ছেড়ে পালাল আর ফিরে আসে নি। উত্তর-বঙ্গের বরেন্দ্রভূমিতেই তাদের উৎপাত খুব বেশি ছিল। তাই সে দিকেই লড়াইও খুব জমজমাট হয়েছিল।

কোলকাতায় দেওয়ানি আর ফৌজদারী দু-রকম মামলার আপিল শোনবার জন্যে যে দুটো সদর আদালত বসবার কথা ছিল নানা কারণে তাদের কাজ আরম্ভ হতে খানিকটা দেরী হয়ে গিয়ে-ছিল। সদর দেওয়ানি আদালত অবশ্য ইংরেজ দেওয়ানের মুঠোর মধ্যে। কিন্তু ফৌজদারি ব্যাপার সব নিজামতের অর্থাৎ নবাবের একতিয়ারে। কৌশলে সেটাকে হস্তগত করতে হয়। তাই সদর নিজামত আদালতকে হঠাৎ বিলিতি পোশাকে সাজিয়ে সভায় বের করলে লোকের চমক লেগে যেতে পারে ভেবে হেস্টিংস তাকে যথা সম্ভব মোগলাই রীতিতে প্রকাশ করার চেষ্টা করলেন। সদর নিজামত আদালতে যিনি প্রধান বিচারক হয়ে বসবেন তাঁর গালভরা ফার্সী নাম দেওয়া হল—দারোগা-ই-আদালত-উল-আলিয়া। তাঁর সনদ এল নবাব মোবারকউদ্দৌলার সই-এতে রীতি মতো নিজামতের মোহরের ছাপ মেরে। তাঁকে সাহায্যের জন্যে রইলেন এক প্রধান কাজী—কাজী-উল্-কুজ্জাত্, আর মুফতি একজন, মৌলভী তিনজন।

এখন এমন একজন লোক মুখে খুঁজে বের করতে হয় যাঁকে

নির্ভয়ে দারোগা-ই-আদালত-উল্-আলিয়ার পদে বসানো চলে। অবশেষে বিস্তর খুঁজেপেতে যাঁকে পাওয়া গেল তাঁর বয়স তখন সত্তর পার হয়ে গেছে। বয়সের ভারে তিনি কুঁজো হয়ে পড়েছেন। কিন্তু তা হলে কি হয়? সদর্-উল্-হক্ খাঁ সাহেব ষোল আনা ছেড়ে আঠারো আনা ইংরেজদের অনুগত। ইংজেদের নির্দেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলবেন। হেস্‌টিংসের পছন্দে মুন্নী বেগমের পুরো সায় পাওয়া গেল। কেন না, হক-সাহেব মহম্মদ রেজা খাঁর বিরুদ্ধে-পার্টির। অতএব মুন্নী বেগমের স্বপক্ষ-পার্টি। অন্য কোনো বিষয়েও কোনো বেগ পেতে হল না।

নবাবী সনদ হাতে আসতেই হেস্‌টিংস একদিন সদর নিজামত আদালতের সবাইকে ডাকিয়ে পাঠিয়ে খেলাত দিলেন। সাজসজ্জা করে সবাই দল বেঁধে কাউনসিল হাউস থেকে সদর আদালতের নতুন বাড়িতে চললেন। তখন বাড়িটা ছিল এখনকার সদর স্ট্রিট আর চৌরঙ্গীর ঠিক মোড়েই যেখানে এখন মিউজিয়মের এক অংশ পড়েছে। পরে স্থানান্তরিত হয় প্রেসিডেন্সী জেনারেল হাসপাতালের জমির উপর বাড়িতে। শোভাযাত্রার সর্বাগ্রে চলেছেন দারোগা-ই আদালত্-উল্-আলিয়া। তাঁর পিছনে কাজী-উল্-কুজ্জাত্ তারপর মুফতী মৌলভী। মাঝখানে স্বয়ং গভর্নর-সাহেব আর মান্যবর কাউনসিলররা। সবার পর অনাহুত রবাহুতের দল। সবাই মিলে আদালত ঘরে গিয়ে খানিকক্ষণ বসে উদ্বোধন-পর্ব সাঙ্গ করলেন।

হেস্‌টিংস খুব সাবধানে চলতে লাগলেন, যাতে লোকের চোখে তাঁর গভর্নমেণ্ট যেন নিজামতকে ছাপিয়ে না যায়। তবে সদর নিজামত আদালতে যা-কিছু ঘটতে থাকলো তার কোনোটাই গভর্নরের অগোচরে নয়। দণ্ড দেবার হুকুমনামায় নবাব-সাহেবের দস্তখত আনানোর আগেই মামলার কাজপত্র হেস্‌টিংস নিজে একবার দেখে নিতেন বিচার ঠিক হয়েছে কি না, সাজার পরিমাণ

অপরাধের মাত্রার সঙ্গে তাল রেখে চলছে কি না। নিজের কিছু বক্তব্য থাকলে তিনি তা নোট করে দিতেন। বলাবাহুল্য মুন্নী-বেগম নবাবকে দিইয়ে সেই রকমই হুকুম পাঠিয়ে দিতেন। হুকুম-নামা নবাবকে পাঠানো, সেখান থেকে ফেরত আনানো ইত্যাদিতে এত সময় লেগে যেত যে পরবর্তীকালে মুন্নীবেগমকে ধরে হুকুম-নামায় নবাব-সাহেবের বদলে দারোগা সাহেবই যাতে কোল-কাতায় বসে নিজামতী মোহরের ছাপ মারতে পারেন তার ব্যবস্থা করিয়ে নিয়েছিলেন। মোহর ছাপবার দরুণ দারোগার মাইনে পাঁচশো টাকা বেড়ে গেল। হাজার থেকে পনেরশো।

মফঃস্বলে ফৌজদারি আদালতে কাজ করবার দরুন কাজী আর মুফতিদের একটা ফর্দ তৈরী করা হয়েছিল, সেটা যদিও দারোগার দপ্তর থেকে বেরিয়েছিল বটে, কিন্তু আসলে তৈরী হয়েছিল খালাসা-দপ্তরে। সেই ফর্দ অনুসারেই কাজী মুফতি নিয়োগ করা হত। কেউ অবসর নিলে কি মারা গেলে খালসা দপ্তরই নতুন নাম পুরণ করে দিত। মামলার সব নথীপত্র কাজীদের প্রথম কলেকটরদের কাছে পাঠাতে হত। কলেকটররা সে সব পড়েশুনে নিজেদের টিপ্পনী কেটে গভর্নরের সেরেস্তায় পাঠিয়ে দিতেন। যেসব বিচার ঠিক হয় নি বলে মনে হত, গভর্নর-সাহেব সে সব বদলে নিজামতের, অর্থাৎ নিজেরই, রায় লিখে ফেরত পাঠাতেন। কলেক্টররা তা টুকে রেখে দিয়ে হুকুম তামিলের জন্যে মফঃস্বলের কাজীদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। সব নিয়ে খানিকটা দেরি হয়ে যেত বটে, কিন্তু কাজীর বিচার দেখতে দেখতে অনেকটা ভদ্রস্থ হয়ে উঠতে লাগল।

আড়াই মাস পরে সদর দেওয়ানি আদালতেও বসে গেল। তবে তার জাঁকজমক নিজামত আদালতের মতো অত জোর ছিল না। হেস্‌টিংস কোনো কালেই জাঁকজমক দেখানোর পক্ষপাতী ছিলেন না। সামান্য যেটুকু দেখাতেন সেটা বাধ্য হয়েই দেখাতেন।

নিয়মাবলী মেতোবেক গভর্নর আর তাঁর কাউনসিলের সবাইকার সদর দেওয়ানি আদালতের আপিল শোনার অধিকার। কিন্তু কার্যত গভর্নর আর ছুজনে কাউনসিলের মিলেই কার্য সমাধা করতেন। তাঁদের সাহায্যের জন্যে থাকতেন রায়রায়ান নিজে আর বড়ো বড়ো ছু-জন কানুনগো ছু-জন স্মার্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। পেসকার নাজির মুহুরী চাপরাশি প্রভৃতি তৃতীয় চতুর্থবর্গের কর্মচারীরাও যে আদালতের শোভাবর্ধন করত সে তো ধরা কথা। প্রথম উৎসাহের চোট একটু কম পড়তে গভর্নর-সাহেব নিজে আর আদালতে যেতেন না। তিনজন কাউনসিলর মিলে কাছারি করতেন। সদর দেওয়ানি আদালত প্রথমটা বেশি দিন চলে নি। ১৭৭৪ সাল পর্যন্ত চলে বন্ধ হয়ে যায়। আবার চালু হয় সেই ১৭৮০ সালে।

আইন যে সত্যি সেটা যাতে বিচারকের সহজে জানতে পারেন হেস্‌টিংস তারও একটা ব্যবস্থা করলেন। তিনি পণ্ডিতদের ডাকিয়ে হিন্দু স্মৃতিশাস্ত্রের আর মৌলভীদের ডাকিয়ে কোরান-হদিসের সংকলন করার কাজে বসিয়ে দিলেন, সঙ্গে সাঙ্গ তার ইংরিজি অনুবাদের কাজও চলতে লাগল। যেখানে যেখানে দেখা গেল শাস্ত্রীয় বিধানে কাজ চলে না, সেখানে সেখানে রেগুলেশন পাস করে নতুন আইনেরও সৃষ্টি করা হত। কিন্তু সেটা অতি সন্তর্পণে, খুবই ধীরে ধীরে। তার বেশির ভাগই ফৌজদারি আইন সংক্রান্ত। হেস্‌টিংস নিজে হিন্দুদের হিন্দু আইনে আর মুসলমানদের মুসলমানী আইনে বিচার করার পক্ষপাতী ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি তাঁর মনোভাব গোপনে রাখেন নি, স্পষ্টভাবেই সকলের কাছে প্রকাশ করে গেছেন। বার বার লিখে গেছেন, এদেশের প্রজাদের তাদের নিজেদের সমাজে প্রচলিত আইন-কানুন থেকে বঞ্চিত করলে সেটা তাদের উপর নির্যাতন করারই সামিল হবে। যে-আইন তারা জানে না, যা জানার উপায়ও তাদের নেই, সেরকম

এক বিদেশী আইন সুবিচারের নাম করে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে সেটা স্রেফ অবিচারেই দাঁড়িয়ে যাবে।

রাজ্য শাসন ব্যাপারেও হেষ্টিংস যতটা পারেন ঐ আদর্শ-ই তাঁর সামনে রেখে তাঁর সংস্কার কর্মগুলোও করে গিয়েছিলেন।

সংস্কার কি একরকমের ? হাজার রকমের।

মিথ্যা একবার বলতে শুরু করলে আরো-অনেক মিথ্যা না বলে যেমন পার পাওয়া যায় না, তেমনি সাফসুতর করার কাজে একবার হাত লাগালে দেখতে পাওয়া যায়, ঐরকম আরো দশটা কাজ একটার পর-একটা ঝটপট এসে পড়ছে। এখানে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে। অন্যান্য ইংরেজ সংস্কারকদের মতো হেসটিংসের ধারণা ছিল না, এদেশের যা-কিছু তা সবই খারাপ। সব-কিছুরই আগাগোড়া শোধন আবশ্যক। এদেশের মানুষের উপর হেসটিংসের বিশ্বাস ছিল। তার দরুন তাঁকে বারবার ঠকতে হলেও তাঁর সে-বিশ্বাস কখনো নির্মূল হয়ে যায় নি। দিশি বহু রীতিনীতি আচার-ব্যবহার বিধিব্যবস্থা ইত্যাদির প্রতি তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল, অনুরাগও ছিল। সংস্কারের নামে সেসব ওলোট-পালোট করে দিয়ে দিশি লোকদের বিলিতি বাঁদর সাজানোতে তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না।

কথাটা হয়তো আর-একটু পরিষ্কার হবে যদি এখানে হেস্‌টিংসের পরবর্তীকালের কয়েকটা কার্যকলাপের সামান্য একটু আভাস দেওয়া যায়। আরবী-ফার্সী বিদ্যা ভালো করে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশে কোলকাতা শহরে একটা বড়ো রকমের মাদ্রাসা স্থাপন (১৭৮২), এশিয়া মহাদেশের ইতিহাস-ভূগোল-পুরাবৃত্ত-শিল্পকলা-সাহিত্য-বিজ্ঞান প্রভৃতি নিয়ে গবেষণা করার দরুন কোলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাকর্মে (১৭৮৪), সার উইলিয়ম জোন্সকে উৎসাহ দেওয়ার আর সাহায্য করার বিষয়ে হেস্‌টিংস-এর যে হাত ছিল, সে-কথা সবারই জানা।

ন্যাথানিয়ল ব্রেসি হ্যাল্‌হেড সাহেবের হিন্দুআইন সংকলনের বই (১৭৭৬) আর বাংলা ব্যাকরণ পুস্তক (১৭৭৮) লেখানো আর ছাপানো বিষয়ে হেস্‌টিংসের কীর্তির কথা অনেকেরই জানা নেই। হুগলিতে চার্লস উইলকিন্স-সাহেবের ছাপাখানা বসানোর ব্যাপারে হেস্‌টিংসের সহায়তার কথাও লোকসমাজে তেমন খুব প্রসিদ্ধ নয়। হ্যাল্‌হেড্‌ সাহেবের বাংলা ব্যাকরণের বইয়ের জন্যে হেস্‌টিংসের অনুরোধেই উইল্‌কিন্স-সাহেব বাংলা অক্ষর খোদাই করিয়ে সেটা ঐ ছাপাখানা থেকেই ছাপিয়ে দেন। দু-জনকে ঐ কাজের জন্যে একযোগে তিরিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হেস্‌টিংসই কাউনসিল থেকে করিয়ে দেন।

উত্তরকালে হেস্‌টিংসই উৎসাহ দিয়ে উইলকিন্স সাহেবের দ্বারা ভগবদ্‌গীতার এক ইংরিজি অনুবাদ করান। বইটির পরিচয় হিসেবে হেস্‌টিংস তার এক সুন্দর ভূমিকা লিখে দেন। তাঁরই বিশেষ সুপারিশে কোম্পানী নিজের খরচায় ঐ বই লণ্ডন থেকে ছাপিয়ে দেন। ভগবদ্‌গীতার একটি শ্লোকার্ধ—কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন—হেস্‌টিসের বড়োই প্রিয় ছিল। সুখে-দুঃখে সেটির ইংরিজি অনুবাদ বহু বার উদ্‌ধৃতি করে তিনি প্রচুর তৃপ্তি পেয়েছেন দেখা যায়।

হেস্‌টিংসের বড়ো বড়ো সংস্কারগুলোর আলোচনা আগেই করা হয়েছে। এবার কয়েকটা ছোটখাটো সংস্কারের উল্লেখমাত্র করে ঐ পর্ব শেষ করা হচ্ছে। গভর্মেণ্ট অফিসগুলোর কাজ যাতে ঠিকঠাক চলতে থাকে তার জন্যে হেস্‌টিংস ভালো ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সরকারী কাজে হেসটিংস নিজেও প্রথম প্রথম রাত বারোটা-একটা পর্যন্ত খাটতেন, কর্মচারীদেরকেও খাটিয়ে নিতেন। কাজ সব ঠিক চলছে কিনা কিংবা তাতে ঢিল পড়ছে কিনা দেখে নেবার জন্যে হেটিংস কয়েকজন বিজ্ঞ কাউনসিলর নিয়ে এক একটি অভ ইন্‌সপেক্‌শন বসিয়ে দিয়েছিলেন।

অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের খরচ বৃদ্ধির সঙ্গে প্রজাদের ঘাড়ে যাতে করের বোঝা বেশি করে না চাপে তার দিকে হেস্‌টিংসের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তাই যেখানে যেখানে তিনি খরচ বাড়িয়েছেন সে-জায়গায় ওম্‌নি তখনই খরচও কমিয়েছেন। ঐ নীতি কঠোরভাবে মেনে চলায় বঙ্গদেশের ঐ সময়কার দারুণ অর্থসংকটে তিনি কাবু হয়ে পড়েন নি।

ইকনমিক্‌স না পড়েও হেসটিংসের জ্ঞান ছিল, দেশের ব্যবসা বাণিজ্য অবাধে চলাচল করতে না দিলে দেশের মঙ্গল নেই। মীর কাশিমের নবাবির আমলে রাতারাতি বড়লোক হয়ে পড়বার নেশায় দিশি বাণিজ্য নিয়ে ইংরেজরা যে কি কেলেঙ্কারী কাণ্ডই না করেছিলেন, সেটা হেস্‌টিংসের খুব মনে ছিল। তাই গভর্নর হয়েই তিনি তিনটি জিনিস—নুন, সুপুরি আর তামাক ছাড়া, অন্য সব পণ্যদ্রব্যের উপর থেকে নানারকমের মাশুল তুলে নিয়ে একইরকমের একটা নির্দিষ্ট মাশুল শতকরা আড়াই টাকা হারে ধার্য করে দিলেন। কি স্বদেশী কি বিদেশী সবাইকারই জন্যে ঐ এক রেট। নুন সুপুরি তামাক, পরে আফিংও, খোদ গর্ভর্নমেণ্টের হাতে রইল। নিলামে চড়িয়ে সেগুলো বিলি করে দেওয়া হত।

মাশুল আদায়ের ব্যাপারেও প্রচুর অব্যবস্থা ছিল। ধার্যকরা মাশুলের উপর ব্যাপারীদের সর্বদাই অতিরিক্ত কিছু দিতে হত। জমিদাররা নিজের নিজের পরগণায় মাশুলঘর বসিয়ে তাঁদের এলাকা দিয়ে মাল যাবার সময় অন্যায়ভাবে একটা উপরি মাশুল আদায় করে নিতেন। সারা রাজ্য জুড়ে বড়ো বড়ো নদীগুলোর দু-পারে এত অসংখ্য ছোটোখাটো মাশুলঘর গজিয়ে উঠেছিল যে গুণে তার ইয়ত্তা করা যেত না। তখনকার দিনে ব্যাপারীদের বেশির ভাগ মালই জলপথে যাতায়াত করত। নৌকাতে কি মাল যাচ্ছে না-যাচ্ছে তার তদারকি করার ছলে সরকারী কর্মচারীরা

ঐসব মাল আটক করে বসত। তখন তাদের প্রত্যেককেই জল খেতে কিছু কিছু না দিয়ে পরিত্রাণ পাবার জো থাকত না। হেস্‌টিংস ছোটোখাটো সব ক'টা মাশুলঘর উঠিয়ে দিয়ে শুধু হুগলি মুর্শিদাবাদ পাটনা আর ঢাকায় চারটে বড়ো বড়ো মাশুলঘর রেখে দিলেন। জমিদারদের পরগণায় পরগণায় চৌকি বসানোর রেওয়াজও তুলে দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে শক্তহাতে হেস্‌টিংস ইংরেজ কর্মচারীদের চোরা দস্তক ব্যবহার উঠিয়ে দিলেন। বিনা মাশুলে আর তাঁরা যত্রতত্র মাল চালান দিতে পারেন না। ঐ চোরা দস্তকের কারবার নিয়েই তো মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের তুমুল ঝগড়া বাধে। তার থেকেই তো শেষ পর্যন্ত তাঁকে নবাবী গদিও হারাতে হয়। ইংরেজদের ঐ চোরা কারবার চালানোর দরুন দিশি ব্যাপারীদের যে কি ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হতে হত সেটা হেস্‌টিংসের অজানা নয়। তাই ওদিকে তিনি খুব কড়া নজরই রেখেছিলেন।

হেস্‌টিংস ঐ সংগে আরো-একটা নিয়ম করে দিয়েছিলেন। সরকারী কাজ ব্যতিরেকে অন্য কোনো কারণেই কোনো ইংরেজ মফঃস্বলের কোথাও গিয়ে বাসা ফাঁদতে পারবেন না। দুর্বল ভীরু সন্ত্রস্ত দিশি লোকজনের মধ্যে গিয়ে ইংরেজরা বসবাস করতে থাকলে অত্যাচার অনাচার যে অনিবার্য সেটা হেস্‌টিংসকে কারো বলে দিতে হয় নি। রকমসকম দেখে এক চৌকস কাউনসিলর তাঁর বাড়ির লোকদের লিখে পাঠিয়েছিলেন, চটপট দু-পয়সা কামিয়ে নিয়ে যে দেশে ফিরে গিয়ে নবাবি করা যাবে তার পথ আর খোলা রইল না।

কোলকাতা থেকে পাটনা পর্যন্ত ডাক বসানোও হেস্‌টিংসের আর এক কীর্তি।

হেস্‌টিংস কিন্তু কাউনসিলর আর অন্যান্য ইংরেজ কর্মচারীদের পরিমাণ মতো সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে একটুও উদাসীন ছিলেন না।

কিসে তাঁরা একটুও আরামে থাকবেন সেদিকে তাঁর বেশ নজর ছিল। হেস্‌টিংসের সংস্কারগুলো তাঁদের বিরুদ্ধে যাওয়ায় গোড়ায় গোড়ায় তাঁরা বেশ-একটু বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। পরে হেস্‌টিংসের সদ্‌ব্যবহারে যুক্তির যথার্থ্যে, সকলের কল্যাণ করার সত্যিকার ইচ্ছায় মুগ্ধ হয়ে তাঁরা আপনা হতেই গভর্নরের অনুগত হয়ে পড়েছিলেন।

কালক্রমে হেস্‌টিংসকে ঘিরে তাঁর এক ভক্তদল গড়ে উঠেছিল। ঐ দলের অগ্রণী ছিলেন জর্জ ভ্যান্‌সিটার্ট—মীরকাশিমের সময়কার গভর্নর হেন্‌রী ভ্যান্‌সিটার্টের ছোটো ভাই। যদিও পরবর্তীকালে উভয়ের মধ্যেকার জমজমা সম্প্রীতিতে বেশ-খানিক চিড় খেয়েছিল, তবু এই সময় জর্জ-ভ্যান্‌সিটার্ট সবদিক দিয়েই হেস্‌টিংসের প্রধান সহায় ছিলেন। তবে এ-কথা বলে নিতেই হয় যে ঐ দলের সবাই অবশ্য এক একটা ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির ছিলেন না। হেস্‌টিংসের সদাশয়তার সুযোগ নিয়ে তাঁরা অনেকরকম অসৎ উপায়েই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করেছিলেন। ফলে, নিজে সৎলোক হয়েও হেস্‌টিংস বদনামের ভাগী হয়েছিলেন, আর উত্তর কালে তার জন্যে বেশখানিক জবাবদিহিও হতে হয়েছিল।

সংস্কার-কাজ চলার সঙ্গে সঙ্গেই মহম্মদ রেজা খাঁ আর সিতাব রায়ের বিচার-কর্মও চলেছিল। সিতাব রায়ের বিরুদ্ধে কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। ছিলই না তো পাওয়া যাবে কি? ডিরেক্‌টররা যে কেন তাঁকেও ধরতে বলেছিলেন তা কেউ ঠিক করে বুঝে উঠতে পারে নি। মনে হয়, খুব সম্ভব বাংলার নায়েব রেজা খাঁকে বেঁধে বিহারের নায়েব সিতাব রায়কে ছেড়ে দিলে সেটা যেন কেমন কেমন দেখতে হবে ভেবেই হয়তো ডিরেক্‌টররা দু'-জনকেই একসঙ্গে ধরে বিচারের জন্যে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। যাই হোক, সিতাব রায় শিগ্‌গিরই ছাড়া পেয়ে গেলেন। কিন্তু কয়েদ থাকার অপমানের মনস্তাপ তো এত সহজে

যাবার নয়? বেকসুর খালাস পাবার পরে তিনি আর বেশি দিন বাঁচেন নি। শোকে মুহ্যমান অবস্থাতেই কোলকাতা থেকে পাটনায় বাড়ি ফিরে যান। তারপর মাসখানেকের মধ্যেই অনন্তমাত্রা।

মহম্মদ রেজা খাঁ কিন্তু অত সহজে রেহাই পেলেন না। পাক্কা দু-বছর নজরবন্দী হয়ে থাকার পর তাঁর বিচার শেষ হল। নন্দকুমারের জানা একটার পর-একটা অভিযোগের একটাও ধোপে টেঁকে নি। ঐরকম সময় সচরাচর যা হয়ে থাকে এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। রেজা খাঁর দ্বারা উপকৃত সবাই তাঁকে একে একে পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন। এক আলী ইব্রাহিম খাঁ তার কাছ থেকে কোনো উপকার না পেয়েও তাঁর হয়ে সমানে লড়ে গিয়েছিলেন। রেজা খাঁর বিরুদ্ধে সমস্ত নালিশ যুক্তি দিয়ে এক এক করে কাটিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন। প্রমাণ-অভাবে হেস্‌টিংস ডিরেক্‌টরদের ইচ্ছা পূরণ করতে পারলেন না। যদিও তাঁর নিজের দৃঢ় ধারণা যে মহম্মদ রেজা খা দোষী সবটা না হলেও খানিকটা দোষী তো বটেই, তবু যখন দোষ প্রমাণ হল না, তখন তাঁকে নির্দোষী-ই সাব্যস্ত করতে হয়। তবে রেজা খাঁ কিন্তু তখনই খালাস পেলেন না। ডিরেক্‌টরদের কাছ থেকে হুকুম না আসা পর্যন্ত তাঁকে কোলকাতাতেই থাকতে হল। হেস্‌টিংস অবশ্য তাঁকে ছেড়ে দেওয়ারই সুপারিশ করে ডেসপ্যাচ পাঠিয়েছিলেন।

আলী ইব্রাহিম খাঁ সেই থেকেই হেস্‌টিংসের সুনজরে পড়ে গিয়েছিলেন। যদিও এককালে তিনি নবাব মীরকাশিমের প্রাণের বন্ধু আর তাঁর প্রধান মন্ত্রী ছিলেন তবু হেস্‌টিংস তাঁর গুণের সমাদর করতে ছাড়েন নি। তাঁকে বারাণসীর দারোগা, অর্থাৎ ফৌজদারী বিচারক করে দিয়েছিলেন। সুদীর্ঘ কাল ঐ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ১৭৯৪ সালে অতি বৃদ্ধ বয়সেই কাশীতেই তাঁর মরণ

হয়। আলী ইব্রাহিম ফার্সী বিদ্যাবিশারদ ছিলেন। অনেকগুলো বই লিখে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ--গুলজার-ই-ইব্রাহিম, কবিতা আর কবিতাকারদের জীবনী সংগ্রহ। দিশি লোকদের রচিত যে-প্রবন্ধ সর্বপ্রথম এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠ করা হয় সেটা ছিল তাঁরই রচনা। বিষয়—হিন্দুদের বিভিন্ন বিচারপদ্ধতি। ফার্সীতে লেখা ঐ প্রবন্ধের ইংরিজি অনুবাদ করে সার উইলিয়ম জোন্স নিজেই সেটা পাঠ করেন।

রেজা খাঁর বিচার চলার মাঝখানেই হঠাৎ এক উৎপাত এসে হাজির। ক্লাইভ বাদশা শা আলমের হাত থেকে দেওয়ানি সনদ নেবার সময় স্বীকার গিয়েছিলেন সুবে বাংলার রাজস্ব বাবদ বাদশা বছরে ছাব্বিশ লাখ করে পাবেন, কিন্তু কোম্পানির টাকার টানা-টানিতে সেটা কমতে কমতে অবশেষে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বাদশা-বাহাদুর তাঁর প্রাপ্য টাকা চেয়ে চেয়ে জেরবার হয়ে গেছেন। ইংরেজরা, তাঁর আবেদন-নিবেদনে কর্ণপাত করেন না।

অতঃপর মারাঠাদের উপর ভর করে শা আলম যখন দিল্লী যাব যাব করছেন তখন এলাহাবাদে তাঁর দরবারে জন্ মরিসন বলে এক ইংরেজ লাফাঙ্গা গিয়ে দেখা দিলেন। মরিসন এক সময় ইংরেজ ফৌজে অফিসর ছিলেন, পদমর্যাদায় মেজর। কাজে ইস্তফা দিয়ে এখন স্বাধীন হয়ে কপাল ফেরানোর চেষ্টায় ঘুরছেন। শা আলমকে কুর্নিশ করে তিনি এক প্রস্তাব দিলেন—হিন্দুস্থানের বাদশা যদি তাঁকে তাঁর প্রতিনিধি করে ইংলণ্ডের রাজদরবারে পাঠান, তাহালে তিনি বাদশার বকেয়া পাওনা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়ে দেবেন। শুধু তাই নয় তার সঙ্গে থাকবে আরো অনেকরকমের সুবিধা। ভবিষ্যতে টাকার জন্যে হিন্দুস্থানের বাদশাকে একটা সওদাগরী কোম্পানীকে ধরাধরি করতে হবে না। সেসব আসবে ইংল্যাণ্ডের রাজমুকুটধারীর কাছ থেকে, তৈমুরলং-এর বংশধর হিন্দুস্থানের বাদশার কাছে। সমানে সমান।

শা আলমের তখন এমনি টাকার টানি-টানি চলেছে যে তিনি সহজেই মরিসনের ফেলা টোপ গিললেন। আলাপ-আলোচনায় বাদশার বাকি-বকেয়া সব মিটিয়ে দিয়ে তাঁকে বছর বছর বত্রিশ লাখ করে মাসোহারা দেন আর যখনই দরকার হবে তখনই যদি যদি গোরা পল্টন পাঠিয়ে আর অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে তাঁকে সাহায্য করেন, তাহলে শা আলম তাঁকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার তাবৎ মুল্লুকই লিখে-পড়ে হস্তান্তর করে দেবেন। ইংল্যাণ্ডের রাজ হবেন সুবে বাংলারও রাজা। বাদশার অধীন সুবাদার-দেওয়ান নন, একেবারে স্বাধীন নৃপতি। রঙিন কল্পলোকের চিন্তায় মশগুল শা আলম খুশিতে ডগমগ হয়ে উঠে মেজর মরিসনকে তখন 'জেনারেল' মরিসন করে দিলেন। খেলাত প্রভৃতি দিয়ে তাঁকে রাষ্ট্রদূতের পদেও বসিয়ে দিলেন। ইংল্যাণ্ডের রাজা জর্জ দ' থার্ডের রাজসভায় তিনি যাবেন হিন্দুস্থানের বাদশা শা আলমের প্রতিনিধি হয়ে।

অতঃপর অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়েই শা আলম দিল্লি যাত্রা করলেন। বাদশাহী মোহর ছাপা সনদ হাতে নিয়ে 'জেনারেল' মরিসন গঙ্গা বেয়ে চুঁচুড়োয় গিয়ে উঠলেন। তিনি বুদ্ধিমান লোক। আগের থেকে হুড়ুম্ করে কোলকাতায় গিয়ে পড়লে কিসের থেকে কি ঘটে যায় ভেবে তিনি চুঁচুড়োয় বসেই ওয়ারেন হেস্টিংসের তাঁর নতুন পদবীর কথা খুলে লিখে দিয়ে জানতে চাইলেন, বাংলার গভর্নর তাঁকে বাদশার প্রতিনিধির প্রাপ্য সম্মানে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন কি না, আর তাকে ইংলণ্ডে পৌঁছে দেবার জন্য কোম্পানীর একটা জাহাজ ছেড়ে দেবেন কিনা।

চরের মুখে হেস্টিংস আগেই খবর পেয়ে গিয়েছিলেন, শা আলমের সঙ্গে মরিসনের কি মর্মে কথাবার্তা হয়েছে আর কি উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ইংল্যাণ্ডে যেতে চাচ্ছেন। সেই সময়ে ইংলণ্ডের রাজা রাজমন্ত্রী পারলামেন্ট—কেউই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উপর সদয়

ছিলেন না। কোম্পানীর অলীক বৈভবের কথা কল্পনার করে তারা কোম্পানীকে দমিয়ে রাখারই কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। শা আলমের প্রস্তাব নিয়ে মরিসন ইংল্যাণ্ডে উপস্থিত হলে নানা-রকমের অনর্থের সৃষ্টি হতে পারে—এই আশংকায় হেস্‌টিংস বেশ-খানিকটা সন্ত্রস্ত। তিনি পত্রপাঠ মরিসনকে লিখে দিলেন, তিনি তাঁকে বাদশার প্রতিনিধি বলে মানতে নারাজ আর কোম্পানীর কোনো জাহাজই তাকে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত নন। চিঠির উপর মেজর মরিসন শিরোনামা দেখে 'জেনারেল' মরিসন তো রেগে কাঁই। হেস্‌টিংসের চিঠি না খুলেই তিনি সেটা পত্রবাহকের হাতে ফেরত দিয়ে জানিয়ে দিলেন, গভর্নর-সাহেব যদি তাঁকে তাঁর পদমর্যাদার মোতাবেক তাঁর যথার্থ টাইটলে তাঁকে চিঠি না লিখতে পারেন, তাহলে তিনি তাঁর লেখা কোনো পত্রই আর গ্রহণ করবেন না।

হেস্‌টিংস ইতিমধ্যে চুঁচুড়োর ডাচ্ গভর্নরকে লিখে দিয়েছিলেন তিনি যেন মরিসনকে ইউরোপ পৌঁছবার জন্যে কোনো ডাচ্ জাহাজ ছেড়ে না দেন। মনে মনে তাঁর মতলব ভাঁজা ছিল মরিসন ইংল্যাণ্ডে পা ফেলবার আগেই তিনি তাঁর সব কল-কৌশল ডিরেক্টরদের কাছে ফাঁস করে দেবেন। কাজটা একটু বে-আইনী গোছের। তাই হেস্‌টিংস তার সমস্ত ঝুঁকিই নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন, কাউনসিলের কাছে কোনো কথাই ব্যক্ত করলেন না। সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বেই তিনি ডিরেক্টরদের সব কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন।

ওদিকে ঘুস দিয়েই হোক কি অন্য আর-কোনো উপায়েই হোক মরিসন শেষ পর্যন্ত এক ডাচ জাহাজে চড়েই ইংল্যাণ্ডে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তখন বড্ডো দেরি হয়ে গেছে। তার অনেক আগেই ডিরেক্টররা হেস্‌টিংসের ডেস্‌প্যাচ পেয়ে সাবধান হয়ে গেছেন। প্রতিকারের সব ব্যবস্থাও করে ফেলছেন। মরিসন কোথাও একটুও

পাত্তা পেলেন না। তাঁর অতি যত্নে ফাঁদা ফন্দিফিকির একেবারে ভেস্তে গিয়ে মাঠেই মারা গেল।

এরপর হেস্‌টিংস মনে-মনে স্থির করেই ফেললেন তিনি কোম্পানীর তবিল থেকে আর-একটি কানাকড়িও শা আলমকে কখনো দেবেন না।

সঙ্গে সঙ্গেই আর-এক কুটকচালে ব্যাপার।

অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা লিখেছেন, তিনি বেশ-খানিকটা বিপাকে পড়েছেন। মহামান্য গভর্নর-সাহেব যদি উত্তর প্রদেশে এসে তাঁকে দয়া করে একবার দর্শন দেন, তাহলে তিনি কৃতার্থ হবেন আর ভবিষ্যতের কার্য-কলাপ সম্বন্ধে একটা-কিছু স্থির করে ফেলে সেই মতো চলতে থাকবেন।

সুজাউদ্দৌলা ইংরেজদের এক মস্ত বড়ো সহায়ক। অন্যান্য দিশি রাজ্যগুলোর সঙ্গে তাঁদের যোগরক্ষার সেতু-বিশেষ। কেননা, বাদশার দরবার যদিও তখন মারাঠাদেরই প্রাধান্য হয়ে উঠেছে তবু অযোধ্যার নবাব তখনো তো সরকারিভাবে—সমগ্র হিন্দুস্থানের উজির। তার উপর মারাঠা ইংরেজদের প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মারাঠা সর্দাররা বেশ বুঝেছেন, হিন্দুস্থানে তাঁদের আধিপত্য বিস্তারের পথে যদি কোনো কাঁটা থাকে, তাহলে তা হচ্ছে ঐ টুপিওয়ালা ইংরেজ। আর, ইংরেজদেরও বুঝতে বাকি নেই যে, এদেশে তাঁদের স্থায়িত্ব নির্ভর করছে মারাঠাদের তাঁরা কতটা দাবিয়ে রাখতে পারেন তার উপর। এখনই হোক কি আর কিছু দিন পরেই হোক উভয়ের মধ্যে বলপরীক্ষা অনিবার্য!

সে যাই হোক, আপাতত সবচেয়ে বড়ো জিনিস হচ্ছে মারাঠা যাতে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার উপর চড়াও হতে না পারে—তার দৃষ্টি রাখা। তার জন্যে নবাব সুজাউদ্দৌলাকে হাতে রাখতে হয় কারণ, মারাঠা অভিযানের প্রথম ধাক্কা তো তাঁকেই পোহাতে হবে। তিনি সেটা সামলাতে পারলেই ইংরেজদের আর মারে

কে? তাই ক্লাইভ থেকে শুরু করে হেস্‌টিংস পর্যন্ত সব ইংরেজ গভর্নরের দিশি পলিটিক্সের মূল সূত্র ছিল অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে মিত্রতা রক্ষা করে চলা। অবশ্য তঁাদের মনে মনে সর্বদাই ভয় ছিল সুজাউদ্দৌলা যে প্রকৃতির লোক তাতে তঁার পক্ষে হঠাৎ মারাঠাদের সঙ্গে মিশে গিয়ে ইংরেজদের বিপক্ষে যাওয়াটা কিছুই আশ্চর্য নয়। তাই উজির সাহেবের প্রতি তাঁদের সোহাগের বহরটা যেন একটু বেশি রকমের।

কিন্তু বিপাকটা যে সত্যি কি দাঁড়িয়েছিল সেটা ভালো করে বুঝতে গেলেতার পূর্ববর্তী কতকগুলি ঘটনার কথা জানবার দরকার হয়ে পড়ে। দিল্লির বাদশাকে তঁার মসনদে বসিয়ে রেখে তঁারই নাম করে হিন্দুস্থানের বিভিন্ন রাজ্যগুলোকে একে একে ছিনিয়ে নিয়ে সেগুলো বাদশার খাসদখলে এনে ফেলে সেগুলো নিজেরাই ভোগ করা—এইটেই ছিল মারাঠাদের আসল অভিসন্ধি। তাই অতি সহজেই তাদের লোলুপ দৃষ্টি গিয়ে পড়ল দিল্লির লাগাও রোহিলখণ্ড-রাজ্যের উপর। জায়গাটা অতি সরেস, হাতে পেলে বিস্তর লাভ। তাছাড়া রোহিলারা পাঠান। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মারাঠা পাঠানদের হাতে যা হাড়চুরচুরে মার খেয়ে ছিল তা তারা তখনো ভোলে নি। ভোলবার কথা নয়। ঐ দারুণ মারের চোট সামলাতে তাদের প্রায় এক পুরুষ কেটে গিয়েছিল।

রোহিলখণ্ডের অধিকাংশ প্রজা যদিও হিন্দু তবু বছর পঁচিশেক ধরে রোহিলারা জোর করে সেখানে বসে গিয়ে রাজত্ব করছে। তাদের সর্দাররা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা দখল করে প্রত্যেকে একটা করে ছোটোখাটো রাজ্য করে বসেছেন।

এই সময় ঐ সর্দারদের দলের প্রধান ছিলেন হাফিজ রহমত খঁা। তার নিচেই ছিলেম জাবিতা খঁা। রাজ্যের দক্ষিণ আর পূর্বদিক ভরে নবাব সুজাউদ্দৌলার সুবাদারি। পশ্চিম দিকে গঙ্গা। উত্তরে হিমালয় পর্বতের পায়ের নিচেকার জঙ্গল তেরাই অঞ্চল।

এই রোহিলখণ্ডকে একবার কবজায় আনতে পারলে অযোধ্যার নবাবকে কাবু করে ফেলতে খুব বেশি সময় লাগবে না। তারপর বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা তো সোজা রাস্তা। লোভে মারাঠাদের চোখ জ্বল জ্বল করে উঠল।

ওদিকে রোহিলখণ্ডের উপর উজির সুজাউদ্দৌলারও লোভ মারাঠাদের চেয়ে এক রত্তিও কম যায় না। ঐ প্রদেশকে নিজের রাজত্বের সঙ্গে যুক্ত করে নিতে পারলে রাজ্যের পূর্ব সীমানাটাকে একেবারে গঙ্গা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারা যায়। তাতে আত্মরক্ষার অনেকটা সুবিধা হয়। তবে সেটা হল গৌণ ব্যাপার। আসল কথা হল রোহিলখণ্ড একেবারে সোনা ফলা। প্রজারাও সবাই ধানেচালে লক্ষ্মীমন্ত। এ-হেন এক উর্বর দেশ তো লোভেরই বস্তু বটে। তাছাড়া রোহিলারা তো গোঁড়া সুন্নি আর অযোধ্যার নবাবরা হিন্দুস্থানেরশিয়া-সম্প্রদায়ের মুসলমানদের মাথার মানিক। উভয়ের মধ্যে অহি-নকুল সম্বন্ধ। আরো একটা কথা। সুজাউদ্দৌলা ভালো করেই জানতেন, রোহিলখণ্ড তিনি না নিলে অবশেষে ওটা মারাঠারাই নেবে। ওরকম একটা দুর্ধর্ষ শত্রুকে ঘাড়ের উপর টেনে এনে বসাতে কারই বা সাধ যায়?

শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা বেশ একটু ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল। কারণ হল, তিন পক্ষের কারো উপরই কারো কোনো ভরসা নেই। কেউ কাউকে প্রাণ খুলে বিশ্বাস করে উঠতে পারে না। মারাঠারা জানে উত্তমরূপে দক্ষিণা পেলে উজির-সাহেব শিয়াসুন্নির সব কলহ-বিবাদ হজম করে ফেলে রোহিলাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যেতে এক মুহূর্তও দেরি করবেন না। ওদিকে কিন্তু রোহিলারা ভাবে তেমন তেমন সুবিধা দেখলে উজির-সাহেব তাদেরকে ছেড়ে মারাঠাদের দিকে গিয়ে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে একদম কসুর করবেন না। আবার সুজাউদ্দৌলা মনে ভাবেন, তাঁর রাজ্য আক্রমণ করার জন্যে রোহিলারা তাদের রাজ্য দিয়ে

মারাঠাদের পথ করে দিতে একটুও পেছপাও হবে না, যদি জানে যে, তাতে করে তারা মারাঠাদের আক্রোশ থেকে উদ্ধার পেয়ে যাবে।

যাই হোক, শা আলমকে দিল্লির সিংহাসনে বসিয়ে দিয়ে মারাঠারা একা একাই রোহিলখণ্ড গ্রাস করতে উদ্যত হল। তাদের আর একটুও তর সইছিল না। তখন ডামাডোলের বাজার। কে কখন তার উপর ছোঁ মেরে বসে তার ঠিক-ঠিকানা নেই। উপায়ান্তর দেখতে না পেয়ে রোহিলা সর্দার নবাব সুজা-উদ্দৌলার সাহায্য চেয়ে বসলেন। একমাত্র তিনিই যদি মারাঠাদের কোনোক্রমে ঠেকাতে পারেন। সুজাউদ্দৌলা আবার তাঁর দিক থেকে ঐ ব্যাপারে ইংরেজদের ডেকে আনলেন। তখন হিন্দুস্থানের অনেকেই জেনে গেছেন, লড়াইয়ের ক্ষেত্রে ইংরেজরা এক মস্ত বড়ো সহায়।

কিন্তু ইংরেজদের এক মজার স্বভাব। অপরের কলহে তাঁরা ঠিক নাক গলিয়ে বসবেন। আর বসিয়ে, শেষ পর্যন্ত ঠিক তার থেকে নিজেদেরই একটা-কিছু সুবিধা করে নিয়ে বেরোবেন। তবু নাচতে বসে তাঁদের মুখে সর্বদাই ঘোমটার আড়াল। এক্ষেত্রে তাঁরা প্রকাশ্যে হাতিয়ার ধরে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যেতে রাজি হলেন না বটে, কিন্তু উজিরকে আশ্বাস দিলেন, তাঁরা তাঁর পিছনে আছেন, তিনি যেন কখনোই মারাঠাদের দলে মিশে না যান। তখনকার ইংরেজ গভর্নর কার্টিয়ার-সাহেব ইংরেজ কমাণ্ডার-ইন্-চিফ সার্ রবার্ট বার্কারকে সেপাই-পলটন সমেত ফৈজাবাদে পাঠালেন বটে, কিন্তু গোপনে তাঁকে জানিয়ে রাখলেন তিনি যেন গায়ে পড়ে মারাঠাদের সঙ্গে বিবাদ বাধিয়ে না বসেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার এও বলে দিলেন মারাঠা যাতে উজিরের এলাকায় ঢুকে থাবল মারতে না পারে সে-বিষয়েও তিনি যেন সতর্ক থাকেন।

এদেশের ইতিহাসে বার বার দেখা গেছে, দিশি লোকদের একদলকে অপর দলের উপর লেলিয়ে দিয়ে ইংরেজরা খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে বেশ মজা দেখেন। বাইরে জাহির করতে থাকেন তাঁরা নিজেরা অতি সভ্যভব্য সাধু ব্যক্তি; মন্দ হচ্ছেন তিনি, যিনি তাঁদেরই উসকানিতে দেশের লোকের বিরুদ্ধে লড়তে নেমেছেন।

পিছনে ইংরেজদের দাঁড়াতে দেখে সুজাউদ্দৌলার মনোবল চতুর্গুণ বেড়ে গেল। তিনি রোহিলাদের কাছ থেকে তাদের সাহায্য করার দক্ষিণা বাবদ এক ক্রোড় টাকা হেঁকে বসলেন। কিন্তু রোহিলারা কিছুতেই পঞ্চাশ লাখের উপর ওঠে না। টাকার অঙ্ক নিয়ে যখন ঐ রকম ধস্তাধস্তি চলেছে, তখন মারাঠারাই হরিদ্বারের কাছে গঙ্গা পেরিয়ে রোহিলখণ্ডের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। তারা বাদশা শা আলমকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। বাদশাহী সৈন্য-সামন্ত নিয়ে কমাণ্ডার নজফ খাঁও সঙ্গে আছেন। মারাঠারা বাদশাকে লোভ দেখিয়েছে—রোহিলারা যে-সব বাদশাহী জমিজমা বেদখল করে নিয়ে সুখে ভোগদখল করছে সে-সবই তারা তাদের হাত থেকে উদ্ধার করে বাদশাকে পাইয়ে দেবে।

রোহিলারা মারাঠা আক্রমণ রোধ করতে পারল না। পদে পদেই হেরে মরল। শেষে জাবিতা খাঁ-ই প্রথম তাঁর ধনরত্ন সব মাটিতে পুঁতে রেখে পরিবারবর্গকে ফেলেফুলে তেরাই-এর জঙ্গলে দৌড় মারলেন। অন্যান্য সর্দাররা তাঁকে অনুসরণ করতে বিন্দুমাত্রও দেরি করলেন না। মারাঠারা এসে দেশটাকে ছেয়ে ফেলল। জাবিতা খাঁর পরিবারবর্গ বাদশার হাতে বন্দী হয়ে পড়ল। কিছুদিনের মধ্যে মারাঠারা খুঁজে খুঁজে রোহিলাদের ধনরত্ন খুঁড়ে বের করে ফেলল। কিন্তু তার মাত্র যৎকিঞ্চিৎ বাদশাকে ঠেকিয়ে বাকি সবই তারা আত্মসাৎ করে নিল। ঐ ভাগাভাগি নিয়েই

বাদশার সঙ্গে মারাঠাদের বিষম মন কষাকষি চলতে লাগল। কিন্তু যত-কিছু লাফালাফি করেও দুর্বলকে শেষ পর্যন্ত প্রবলের কাছে হার মানতেই হয়। বাদশাকেও মানতে হল।

ওদিকে তেরাই অঞ্চলে রোহিলাদের আরো বিপদ। জঙ্গলে ম্যালেরিয়া আর ওলাওঠার চোটে তারা পটাপট মরতে লাগল। বহু লোক তাদের সর্দারদের ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে প্রাণ বাঁচাল। তখন জাবিতা খাঁ, হাফিজ রহমত খাঁ জঙ্গল থেকে বেরিয়ে শেষে সুজাউদ্দৌলারই ক্যাম্পে আশ্রয় নিলেন। তখন উজির-সাহেব ইংরেজদের নিয়ে তাঁর রাজত্বের একেবারে উত্তর-পশ্চিম কোণায় ক্যাম্প পেতে বসেছেন। মারাঠা একে একে সমস্ত রোহিলখণ্ড দখল করে বসেছে দেখে তাঁরও মনে ভয় ঢুকে গিয়েছিল।

এর কিছুদিন আগেই সুজাউদ্দৌলা মারাঠাদের সঙ্গে যোগ দিতে গিয়েছিলেন, ইচ্ছা ছিল উভয়ে মিলে রোহিলখণ্ড নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবেন। কিন্তু ইংরেজ কমাণ্ডার সেটা কিছুতেই ঘটতে দেন নি। তাঁরই আগ্রহে নবাব সুজাউদ্দৌলা রোহিলাদের সমাদরেই গ্রহণ করলেন। ততক্ষণে মারাঠা জেনারেল বিশাজী দিল্লী ফেরার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, কারণ বর্ষা এসে পড়ল বলে। ঠিক ওম্‌নি সময় সুজাউদ্দৌলার কাছ থেকে প্রস্তাব এল, মারাঠারা যদি রোহিলখণ্ড ত্যাগ করে চলে যায়, তাহলে রোহিলারা তাদের চল্লিশ লাখের খেসারত দেবে, আর তার জন্যে উজির-সাহেব স্বয়ং জামিন থাকবেন। বিশাজী ঐ প্রস্তাব লুফে নিলেন। নিয়ে, তখনই রোহিলখণ্ড ছেড়ে চললেন। তাঁর এক পা তো বাড়ানোই ছিল। বাদশাও তাঁর দলবল নিয়ে বাড়ি চললেন নিতান্তই ক্ষুণ্ণমনে।

মারাঠারা বিদায় হতেই রোহিলারা সবাই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। সর্দাররা আবার নিজের স্থানে গিয়ে বসলেন। জাবিতা খাঁর পরিবারবর্গকেও সুজাউদ্দৌলা বাদশার হাত থেকে

মুক্ত করিয়ে নিয়ে স্বদেশে ফিরিয়ে এনেছেন। কিন্তু সবাই বেশ বুঝতে পারলেন, যা হল তা দু-দিনেরই মাত্র ব্যাপার। মারাঠারা আবার এসে ঠিক হানা দেবে। কারণ, শোনা গেল, বিশাজীর সঙ্গে সন্ধিটা মারাঠা সর্দার মহাদাজী সিন্ধিয়ার একেবারেই পছন্দ হয় নি। তখন হিন্দুস্থানের পলিটিক্স-এর খেল্‌-এ মারাঠাদের দিকে তিনজন বড়ো খেলুড়ে—মহাদাজী সিন্ধিয়া, তুকোজী হোল্‌কার, আর বিশাজী কৃষ্ণন, পেশওয়ার প্রতিনিধি। তবে রোহিলাদের আপাতত লাভ হল যে, সেই চল্লিশ লাখ তখনই পকেট থেকে বের করে দিতে হল না।

শেষেরও শেষ নেই। তখনো মারাঠা জুজুর ভয়ে সবাই কাঁপছে। ভবিষ্যৎ ভেবে রোহিলা সর্দাররা উজির সুজাউদ্দৌলাকেই আশ্রয় করা বুদ্ধির কাজ হবে বলে মনে করলেন। তাই উভয় পক্ষের মধ্যে একটা লিখিত-পড়িত কড়ার হয়ে গেল। তার সাক্ষী রইলেন জেনারেল সার রবার্ট বারকার। ১০ জুন ১৭৭২। চুক্তির সার কথা—ছলেই হোক, বলেই হোক আর কৌশলেই হোক—সুজাউদ্দৌলা মারাঠাদের রোহিলাখণ্ড থেকে তাড়াতে পারলে রোহিলাদের কাছ থেকে চল্লিশ লাখ টাকা পাবেন। কিন্তু রোহিলারা বুঝতে পারল না, ঐ চুক্তিতে সই দিয়ে তারা নিজেদের মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানায় সই মেরে বসেছে।

বেশীদিন যেতে হল না। চর মারফত মারাঠারা যেই শুনল যে নবাব সুজাউদ্দৌল্লার সঙ্গে রোহিলাদের একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে, ওমনি তারা একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। স্থির করে ফেলল, এবার উভয়কেই ঘায়েল করে তবে ছাড়বে। দু-পক্ষকেই ভালো করে শিক্ষা দিয়ে দেবে, মারাঠাদের সঙ্গে লাগতে যাওয়ার কি ফল!

মারাঠাদের প্রথম চেষ্টা হল একজন রোহিলা সর্দারকে দল ভাঙিয়ে নিজেদের দিকে টানা। তাই তারা বাদশাকে ধরে বসল

তিনি যেন জাবিতা খাঁকে আবার তাঁর মীর বক্শি করে নেন। তার পর তারা বাদশার কাছে প্রস্তাব করল, তিনি যেন কোরা আর এলাহাবাদ জেলা ছুটো তাদেরই নামে লিখে দেন। সঙ্গে সঙ্গে অযোধ্যা আর বিহার আক্রমণের জন্যে একটা লোক-দেখানো অনুমতিও চেয়ে বসল। শা আলম কিন্তু তিনটের কোনোটাতেই রাজি হলেন না। বচসা হতে হতে সেটা বিবাদে গিয়ে দাঁড়াল; বিবাদ থেকে লড়াইয়ে। দিল্লির পুরনো কেল্লার কাছে বাদশার সেনাপতি নজ্ফ খার সঙ্গে মারাঠাদের যে যুদ্ধ হল, তাতে বাদশাহী ফৌজ তো হেরে ঢোল হয়ে গেল। যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে কোথায় পালাল।

অতঃপর বাদশা জাবিতা খাঁকে মীর বক্শি করে নিলেন। কোরা আর এলাহাবাদ মারাঠাদের লিখে দিয়ে তার এজেণ্টকে বলে পাঠালেন, মারাঠাদের যেন ওছ-টো জাইগির ছেড়ে দেওয়া হয়। অযোধ্যা আর বিহার আক্রমণে বাদশার সায় না থাকলেও মারাঠারা ধরে নিল, বাদশার অনুমতি পাওয়া গেছে। নজ্ফ খাঁ বাদশাহী ছেড়ে দক্ষিণী ফৌজে গিয়ে নাম লেখালেন। মারাঠারা আবার গঙ্গা পেরিয়ে রোহিলখণ্ডে প্রবেশ করল।

সুজাউদ্দৌলাও কিছু কম যান না। রোহিলাদের সঙ্গে একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত হওয়ার পর থেকেই তিনি কোলকাতায় চিঠির পর চিঠি ছেড়ে যাচ্ছিলেন। হেস্টিংস গোড়ায় উজির-সাহেবের কথায় তেমন কান দেন নি। ডিরেক্টররা বিশেষ করে বলে দিয়েছিলেন, দিশি রাষ্ট্রগুলোর বিবাদ-বিসম্বাদে হেস্টিংস যেন কোম্পানীকে টেনে নিয়ে গিয়ে না ঢোকান। তাই বিহারের বাইরে ইংরেজ ফৌজ পাঠাতে হেস্টিংস খুবই ইতস্তত করছিলেন। বেশ বুঝছিলেন সেটা করলে বাড়াবাড়িই হয়ে যাবে। কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ বিধান কে কবে এড়াতে পেরেছে।

অযোধ্যার নবাব অতিশয় চতুর ব্যক্তি। কথার ফাঁদ পেতে

লোক বশ করবার ক্ষমতাও ছিল তাঁর অদ্ভুত। তিনি এম্‌নিভাবে ঘটনাগুলোকে সাজিয়ে কোলকাতায় বর্ণনা করে পাঠাতে লাগলেন যে, কাউনসিলে সবাইকারই মনে হতে লাগল যে, মারাঠারা বুঝি নবাবের রাজত্ব নিল বলে, রোহিলারাও নাকি তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যাও তাদের কবলে যেতে আর বিলম্ব নেই। এমন অবস্থায় আর গড়িমসি করাটা মহা অপরাধে দাঁড়িয়ে যাবে। হেস্‌টিংস ইংরেজ ফৌজকে সুজাউদ্দৌলার সাহায্যে এগিয়ে যেতে অর্ডার দিলেন। নিজের সত্যিকার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি ঐ মারাঠা রোহিলা-সুজাউদ্দৌলা হ্যাঙ্গামে জড়িয়ে পড়লেন।

সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে ইংরেজ ফৌজ আসছে শুনেই মারাঠাদের লড়াইয়ের ইচ্ছায় অনেকটা টান পড়ে গেল। তখন মতলব হল নিরীহ প্রজাদের সর্বস্ব লুঠ করে নিয়ে সরে পড়া। তবু লড়াই একটা বেধে গেল। মুশকিল এই যে, লড়াই একবারে বেধে গেলে সেটা নিজের বেগেই অনেক দূর এগিয়ে চলে যায়। তখন পূর্বের দেওয়া কোনো নিষেধই আর কাজে লাগে না, তখন একমাত্র নীতি হয় ক্ষেত্রকর্ম বিধীয়তে—অর্থাৎ অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। ইংরেজরাও কোনো মানা না মেনে মারাঠাদের তাড়া করে গেলেন। কিন্তু কিছুতেই আর তাদের নাগাল পান না। তারা আজ এখানে কাল ওখানে, পরশু আর-একখানে। কেউ-ই কোনোখানে দু-দণ্ড স্থির হয়ে বসতে পারে না; অনবরতই চর্কির মতো ঘুরপাক খেতে থাকে। ইংরেজরা দূর থেকেই তোপ দাগতে থাকেন। কিন্তু তাঁদের ছ-সেরী গোলাগুলোর দাপট বড়ো কম নয়। রোহিলা সর্দার হাফিজ রহমত খাঁ এতক্ষণ সুজাউদ্দৌলার পক্ষে যোগ দেন নি; দূরে বসেই পরখ করছিলেন কোন্ পক্ষ জেতে হারে। এইবার তিনি ইংরেজদের ক্যাম্পে গিয়ে ঢুকলেন।

কিন্তু ততক্ষণ মারাঠা জেনারেল বিশাজী কৃষ্ণন ঠিক করেই ফেলেছেন, তিনি দলবল নিয়ে দক্ষিণেই ফিরে যাবেন। তার ঐ

সঙ্কল্প কেন যে, তার কারণ সঠিক বলা শক্ত। ছোটাছুটির দরুন হয়রানি হয়ে, না ছোটোখাটো একটা সেনাদল নিয়ে—ইংরেজদের বিরুদ্ধে লাগতে যাওয়া বিপজ্জনক মনে করে, না দক্ষিণ থেকে যে খবর এসেছে যে সেখানকার পলিটিক্স প্যাঁচালো হয়ে উঠছে সেই জন্যে ? যাই হোক, তিনি ইংরেজদের সঙ্গে ঝগড়া পাকানোর সব দোষটাই তুকোজী হোল্‌কারের উপর চাপিয়ে দিয়ে নিজে সুজাউদ্দৌলার কাছে শান্তির প্রস্তাব করে পাঠালেন।

দেখতে দেখতে সব মিটমাট হয়ে গেল। মারাঠারা দেশে ফিরে চলল। তার পর আর কোনো দিন তারা রোহিলখণ্ডে এসে ঢোকে নি। আর কোরা এলাহাবাদ তাদের হস্তগত হয় নি।

দশ

মারাঠা আক্রমণের বিপদ রইল না বটে কিন্তু রোহিলারা অন্য বিপদে পড়লেন। সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে তাঁদের কড়ার ছিল, যে করেই হোক মারাঠারা বিদায় হলে, সুজাউদ্দৌলা রোহিলাদের কাছে চল্লিশ লক্ষ টাকা পাবেন। মারাঠারা প্রস্থান করতেই সুজা সেই টাকা চেয়ে বসলেন। টাকাটা দিয়ে দেবার অবস্থা রোহিলাদের কোনো কালেই ছিল না। যাতে না দিতে হয় সেজন্য তাঁরা নানা রকম ওজর আপত্তি তুললেন। বলা হল সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে মারাঠাদের কোনো যুদ্ধই হয় নি। অবস্থা খারাপ দেখে তারা নিজেরাই ফিরে গিয়েছে। কাজেই টাকা দেবার কোনো কথাই ওঠে না। তাছাড়া রোহিলারা প্রশ্ন তুললেন, কে বলেছে মারাঠা আক্রমণের ভয় আর নেই? ওরা তো বছর বছর আসে। কিছুদিন চুপ করে থাকার পর তারা হয়তো আগামী বছর রোহিলখণ্ডে দেখা দেবে। সুজউদ্দৌলার জবাব হল, শর্তে একরম কথা ছিল না যে মারাঠাদের মেরে তাড়াতে হবে। কাজেই প্রাপ্য টাকা না দেবার সঙ্গত কারণ নেই। সুজাউদ্দৌলা অবশ্য রোহিলাদের জবাবে খুসী হন নি। কিন্তু আসল বিপদ কোথায় রোহিলারা তখন সে কথা বুঝতে পারেন নি। কিছুদিন পূর্বে অগাস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে (১৭৭৩ সাল) ওয়ারেন হেস্‌টিংস সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে কাশীতে একটি গোপন চুক্তি করেছিলেন। একে বলা হয় বারাণসীর চুক্তি। এর একটি শর্ত ছিল যে কথার খেলাপ করলে, অর্থাৎ মারাঠারা চলে গেলে যদি রোহিলারা সুজাউদ্দৌলাকে তাঁর প্রাপ্য টাকা না দেন,

তাহলে সুজা রোহিলখণ্ড ইংরাজদের সাহায্যে অধিকার করে নেবেন। সুজা ইংরাজ সৈন্যদের সমস্ত খরচ এবং কোম্পানীকে চল্লিশ লক্ষ টাকা দেবেন। রোহিলাদের কাছে টাকা যখন পাওয়া গেল না তখন সুজাউদ্দৌলার এই চুক্তির কথা মনে হল। দু-পক্ষই প্রথমে অনেকটা ইতস্ততঃ করেছিলেন। কোম্পানীর পলটনকে যুদ্ধে নামাতে হলে খরচের অঙ্ক অনেক ভারী ; তাছাড়া চল্লিশ লক্ষ টাকা। হেস্‌টিংসও বারাণসী চুক্তির পর মনে করেছিলেন কাজটা ভাল হয় নি। এ নিয়ে কাউনসিলে আলোচনাও হয়েছিল। হেস্‌টিংস প্রথমটা ভেবেছিলেন সুজা শেষ পর্যন্ত হয়তো ইংরেজদের সাহায্য চাইবেনই না। অবস্থা দেখে প্রথমে এই কথাই মনে হয়েছিল। কিন্তু ফেব্রুয়ারি মাসে সুজাউদ্দৌলা শেষ পর্যন্ত কোম্পানীর সাহায্য নেওয়াই স্থির করলেন।

পরের ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। রোহিলাদের সর্বনাশের কাহিনী। ইংরেজ সেনাপতি আলেকজাণ্ডার চ্যাম্পিয়ন সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে রোহিলখণ্ড আক্রমণ করলেন, রোহিলাদের নেতা হাফিজ রহমত খাঁ যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিলেন। রামপুর ও তার চারপাশের জমি দেওয়া হল রোহিলা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আলি মহম্মদের ছেলে ফয়জুল্লা খাঁকে। তিনি হলেন রামপুরের নবাব। রোহিলাদের রাজ্যের বাকি অংশ অর্থাৎ প্রায় সবটা, সুজাউদ্দৌলা দখল করলেন।

রোহিলাদের প্রতি হেস্‌টিংসের আচরণ নিয়ে অল্পদিন পরেই এখানে এবং বিলাতে কোম্পানীর ডিরেক্টর মহলে হৈ চৈ হয়েছিল। একটি স্বাধীন রাজ্যকে প্রায় বিনা কারণে সুজাউদ্দৌলার মতো অকর্মণ্য শাসকের হাতে তুলে দিয়ে হেস্‌টিংস কি ভাল কাজ করেছেন? হেস্‌টিংস নিজেও খানিকটা আন্দাজ করতে পেরেছিলেন রোহিলাদের ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হবে। কিন্তু এর ফল তাঁর নিজের পক্ষে কি রকম মারাত্মক হবে সে কথা জানা তাঁর পক্ষে তখন সম্ভব ছিল না।

জানতে পারলেন কয়েক মাস পরে, যখন পার্লামেন্টে রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাস হবার ফলে কোম্পানীর রাজ্যের নিয়ম-কানুন বদলে গেল এবং হেস্‌টিংসের নতুন সহকর্মীরা বিলাত থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন। কিন্তু তার আগে কোম্পানীর শাসনের পদ্ধতি কেন বদলান হল সে কথা বলা দরকার।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভ কোম্পানীর শাসনের প্রতিষ্ঠা করলেন। পলাশীর পরে বক্সার। বক্সারের যুদ্ধে হেরে গিয়ে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব মীরকাশিম দেশ ছেড়ে পালিয়ে গেলেন। ক্লাইভ দ্বিতীয়বার গভর্নর হয়ে বাংলা দেশে এলেন। সম্রাট শাহ্‌ আলমের হাত থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী অর্থাৎ খাজনা আদায়ের ক্ষমতা কোম্পানীকে দেওয়া হল। বিলাতে যাঁরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীতে টাকা লগ্নী করেছিলেন তাঁদের মনে হল এমন শুভদিন আর কখনো আসে নি। কোম্পানীর একেবারে বাড়বাড়ন্ত অবস্থা। কিন্তু অবস্থা আসলে সে রকম ছিল না। কয়েক বছরের মধ্যে কোম্পানীর রাজ্য অনেক বড় হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু খরচও অনেক বেড়েছে। যাঁরা কোম্পানীর ভিতরের অবস্থা জানতেন তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন এ অবস্থা চললে কোম্পানীর কারবার গুটিয়ে ফেলতে হবে। ১৭৬৭ সালেও কোম্পানী শতকরা সাড়ে বারো হিসাবে অংশীদারদের 'ডিভিডেণ্ড' দিচ্ছিলেন বটে, কিন্তু কোম্পানীর সে রকম সঙ্গতি ছিল না। ১৭৭২ সালে কোম্পানীর ঋণের পরিমাণ ছ-মিলিয়ন পাউণ্ডের উপরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কয়েক বছর ধরে রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে দিল্লীর সম্রাট, বাংলার নবাব এবং আরও অনেককে বার্ষিক বৃত্তি দিতে হত। এই টাকার পরিমাণ অন্তত এক লক্ষ পাউণ্ড। কোম্পানীর সেনাদলে ত্রিশ হাজার লোক। তাদের মাইনের পরিমাণও কম নয়। প্রায় ত্রিশ বছর ধরে উত্তর ভারতে এবং দক্ষিণে কোম্পানী

যুদ্ধবিগ্রহ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। তার খরচ কোম্পানীর সর্বস্বান্ত হবার পক্ষে যথেষ্ট। ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষের অর্থাৎ বাংলা দেশে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে কোম্পানীর সর্বনাশ হবার উপক্রম হল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র দুর্ভিক্ষের বর্ণনার সঙ্গে বাঙ্গালী পাঠকের পরিচয় আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'র দুর্ভিক্ষের অবস্থা কল্পনা করে বাড়িয়ে বলেন নি; হাণ্টার সাহেবের ইতিহাসের বই থেকে গ্রহণ করেছিলেন। এই সব নানা কারণে কোম্পানীর দরজা বন্ধ হবার উপক্রম হয়েছিল।

তাছাড়া আর-একটি বড় বিপদ ছিল। বিলাতে কেউ কেউ প্রশ্ন করতে আরম্ভ করছিলেন কোম্পানীর কি রাজ্যশাসন করার এক্তিয়ার আছে? রানী এলিজাবেথ তো কোম্পানীকে শুধু ব্যবসা করবার জন্য সনদ দিয়েছিলেন। যাই হোক কোম্পানী যে রাজ্যের পত্তন করেছিল তা ইংরাজ সরকারের হাতে আসুক। এই সব আলোচনা কোম্পানীর ডিরেক্টরদের পরে অশান্তির কারণ হয়েছিল। এর ফলে ১৭৬৭ সালে ইংরেজ সরকারের সঙ্গে এই মর্মে একটা রফা হয়েছিল—বছরে চার লক্ষ পাউণ্ড কোম্পানীর আয় থেকে সরকারকে দেওয়া হবে। ভাবতবর্ষের কোম্পানীর শাসনের প্রকৃত অবস্থা জানবার জন্য পার্লামেণ্ট থেকে দুটি কমিটিও বসানো হয়েছিল। তাদের রিপোর্টে কোম্পানীর রাজত্বের কুশাসনের যে ছবি বের হল তখন কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা আরও বেড়ে গেল। তাঁরাও কয়েকজন বিশেষজ্ঞকে এদেশে পাঠিয়ে শাসন-ব্যবস্থার উন্নতি করতে চাইলেন। তাদের নাম দেওয়া হল 'সুপারভাইজর'। তাঁরা সংখ্যায় ছ-জন হবেন। প্রত্যেকের মাইনে বছরে দশ হাজার পাউণ্ড। ইংরেজ সরকার এই ব্যবস্থায় রাজী হলেন না। বলা হল, কোম্পানীর টাকার যা টানাটানি অবস্থা তাদের পক্ষে এত খরচ করা সম্ভব হবে না।

১৭৭৩ সালে কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা এমন সঙ্গীন হয়ে

দাঁড়াল যে ডিরেক্টররা আবার ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর দ্বারস্থ হলেন। পার্লামেণ্ট চৌদ্দ লক্ষ পাউণ্ড কোম্পানীকে সাহায্যের জন্য বরাদ্দ করলেন। কোম্পানীকে শতকরা চার হিসাবে সুদ দিতে হবে। কোম্পানী এ যাত্রা রক্ষা পেল।' লর্ড নর্থ এই সঙ্গে একটি আইন পাস করে কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থাকে অনেকটা বদলে দিলেন। এই আইনকে বলা হয় রেগুলেটিং অ্যাক্ট। এই আইনের ফলে কয়েকটি বড় রকমের পরিবর্তন হল। তার মধ্যে কয়েকটির কথা বলছি। পূর্বে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টররা বছর বছর নির্বাচিত হতেন। সে নিয়ম ওঠে গেল, তার বদলে ঠিক হল ডিরেক্টররা চার বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন। কিন্তু প্রত্যেক বছর তাঁদের চার ভাগের এক ভাগকে চলে যেতে হবে এবং তাঁদের জায়গায় নতুন লোক আসবেন। যাঁরা আইন পাস করেছিলেন, তাঁদের এই আশা ছিল যে কোম্পানী পুরনো ডিরেক্টরদের সঙ্গে উৎসাহী কিছু নতুন লোক থাকলে কোম্পানীর ভাল হবে। কোম্পানীর রাজস্ব-সংক্রান্ত কাগজপত্র ডিরেক্টরদের হাতে পৌঁছবার পনের দিনের মধ্যে ইংরেজ সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে। কোম্পানীর রাজত্ব বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ —এই তিন প্রেসিডেন্সিতে ভাগ। প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে একজন করে গভর্নর ও তাঁকে সাহায্য করবার জন্য একটি করে কাউনসিল। প্রত্যেক কাউনসিলে আট-দশ জন করে সদস্য। কোম্পানীর কাজে তাঁরা প্রেসিডেনসির নানা জায়গায় থাকতেন। চলাচলের ব্যবস্থা ভাল ছিল না। বর্ষার সময় তো অসুবিধা ছিল। এই সব কারণে কাউনসিলের সব সদস্য যে সব আলোচনায় যোগ দিতেন তা নয়। বিশেষ কারণ না থাকলে সব সদস্যদের উপস্থিত থাকবার কথাও ভাবা হত না। নিজের এলাকার মধ্যে বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ—প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিরই অবাধ ক্ষমতা। বিলাত থেকে কোম্পানীর ডিরেক্টররা হুকুম দিতেন। সেই হুকুম

মেনে চলতে হত। রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাস হবায় পর এই ব্যবস্থা বদলে গেল। প্রত্যেক প্রেসিডেন্সিতে একজন করে গভর্নর ও তাঁর কাউনসিল রইল বটে, সদস্যদের সংখ্যা কমে গেল। বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির ক্ষমতাও কমে গেল। সর্ব-ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যাপারে বাংলা দেশের গভর্নরকে ক্ষমতা দেওয়া হল। গভর্নরের নতুন নামকরণ হল গভর্নর জেনারেল। তাঁর কাউনসিলের সদস্য চারজন। বাংলা প্রেসিডেনসি শাসনের ভার এবং সেনাবাহিনীর ক্ষমতা এই কাউনসিলের হাতে এল। এরা পাঁচ বছরের জন্য সদস্য থাকবেন। এই সময়ের মধ্যে তাঁদের সরানো চলবে না। তবে কোম্পানীর ডিরেক্টররা কাউকে সরানো দরকার মনে করলে রাজার কাছে আবেদন করবেন। গভর্নর জেনারেলের কাউনসিলে মতভেদ হলে ভোট নিতে হবে। দু-পক্ষের ভোট সমান হলে গভর্নর জেনারেল বাড়তি ভোট দিতে পারবেন। বোম্বাই ও মাদ্রাজের কাউনসিলের এই ব্যবস্থা। রেগুলেটিং অ্যাক্টের ফলে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেনসির উপর বাংলা প্রেসিডেনসির প্রাধান্য স্বীকার করে নেওয়া হল। যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভ করার আগে কিংবা সন্ধিপত্র সই করার আগে বোম্বাই ও মাদ্রাজ কাউনসিল বাংলা প্রেসিডেনসির কাউনসিলের অনুমোদন নেবেন।

১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং অ্যাক্ট পারলামেন্টে পাস হল। এর কয়েক মাস পরে ক্লাইভ আত্মহত্যা করলেন। রেগুলেটিং অ্যাক্টের কোনও কোনও অংশে ক্লাইভের হাত ছিল। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে ক্লাইভ বুঝতে পেরেছিলেন কোম্পানীর রাজত্ব ভাল করে চালাতে গেলে গভর্নর জেনারেলকে অনেক বেশী ক্ষমতা দিতে হবে। বাংলার গভর্নরের চেয়ে ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা অনেক বেশী ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু নতুন গভর্নর জেনারেলের কাছে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল সে ক্ষমতাও যথেষ্ট নয়।

নতুন আইনের ফলে যে চারজন সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন—জন ক্লেভারিং, মনসন, রিচার্ড বারওয়েল ও ফিলিপ ফ্রান্সিস। এদের মধ্যে রিচার্ড বারওয়েল তখন বাংলাদেশে। ইনি উইলিয়াম বারওয়েলের ছেলে। উইলিয়াম বারওয়েল নবাব আলীবর্দির সময় কিছুদিন বাংলা দেশের গভর্নর ছিলেন। শোনা যায়, রিচার্ড বারওয়েল সাধু-অসাধু উপায়ে অনেক টাকা করেছিলেন। রাইটার্স বিল্ডিং-এর বাড়িটি এক সময় তাঁর সম্পত্তি ছিল। কর্নেল মনসন দশ বছর আগে দক্ষিণ ভারতে কোম্পানীর সেনাবিভাগের কর্মচারী ছিলেন।

জন ক্লেভারিং পূর্বে কখনও ভারতবর্ষে আসেন নি। ফ্রান্সিসও তাই। ফ্রান্সিস সুপ্রিম কাউন্সিলের সদস্য হয়েছেন এই খবরে তখন যথেষ্ট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। ফ্রান্সিস রাজনীতির ক্ষেত্রে অপরিচিত। তাঁর মুরুব্বির জোরও সে রকম ছিল না। তবে কি করে সম্ভব হল ? এর উত্তরে একটি কথা সাধারণত বলা হয়। বিশ্বাস করা উচিত কিনা জানি না। সে সময় ইংলণ্ডের খবরের কাগজে 'জুনিয়াস' নামে একজন ছদ্মনামা লেখকের আবির্ভাব হয়েছিল। সে সময় ইংলণ্ডে এমন কোনোও বিখ্যাত লোক ছিলেন না যিনি জুনিয়াসের কলমের খোঁচায় জর্জরিত হন নি। 'জুনিয়াস' কে এখন পর্যন্ত নিঃসংশয়ে বলা সম্ভব নয়। কেউ কেউ জুনিয়াসের লেখা থেকে ধরবার চেষ্টা করেছেন লেখকের আসল পরিচয় কি এবং নানারকম সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন। এঁদের মতে তখনকার অন্তত ত্রিশ-চল্লিশ জন বিখ্যাত লোককে জুনিয়াস বলে সনাক্ত করা যায়—এদের মধ্যে এডমণ্ড বার্ক, লর্ড চ্যাথাম, স্যার উইলিয়াম জোনস, এমন কি মিসেস মেকলে পর্যন্ত আছেন। ফিলিপ ফ্রান্সিস কি সত্যই 'জুনিয়াস' ? এর সদুত্তর আছে কি না জানি না। তবে শোনা যায় ফিলিপ ফ্রান্সিস সুপ্রীম কাউন্সিলের সদস্য হয়েছেন শুনে রাজা তৃতীয় জর্জ বলেছিলেন, এইবার জুনিয়াসের মুখ বন্ধ হল।

১৭৭৪ খৃস্টাব্দের ১৯ অক্টোবর সুপ্রীম কাউনসিলের সদস্যরা কলকাতা এসে পৌঁছলেন, ক্লেভারিং মনসন ও ফ্রান্সিস। প্রথম দিন থেকেই তিনজন সদস্যের সঙ্গে হেস্‌টিংসের বিরোধ আরম্ভ হল। হেস্‌টিংসের সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র ফ্রান্সিসের মনে হল ইনি দেখতে মেষশাবক, কিন্তু আসলে নেকড়ে বাঘ। আর বারওয়েল? বারওয়েলের মতো মূর্খ ও নির্বোধ ব্যক্তি পূর্বে কখনও তাঁর চোখে পড়ে নি। কয়েক বছর ধরে গভর্নর ও কাউনসিলের সদস্যদের সঙ্গে বিচিত্র কলহ চলতে লাগল। দু-বছর পরে মনসন মারা গেলেন। তারও এক বছর পরে ১৭৭৭ সালের অগাস্ট মাসে ক্লেভারিং-এর মৃত্যু হল। ১৭৮০ সালের নভেম্বর মাসে ফ্রান্সিস ইংলণ্ডে ফিরে গেলেন। হেস্‌টিংস খুসী হয়ে ইংলণ্ডে তাঁর এক বন্ধুকে চিঠি লিখলেন, এইবার আমার জীবনের এক অধ্যায় শেষ হল; নতুন অধ্যায় আরম্ভ হচ্ছে। কিন্তু যে অধ্যায় শেষ হল তার ফলভোগ তখনও বাকী ছিল। ভারতবর্ষ থেকে অবসর নিয়ে ফিরে যাবার পর হেস্‌টিংস সে কথা বুঝতে পেরেছিলেন।

———

এই রচনার নবম অধ্যায় পর্যন্ত তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের রচনা। দশম অধ্যায়ে রচনার সমাপ্তি হবে এ আভাসও তিনি দিয়েছিলেন, কিন্তু শেষ করে যেতে পারেননি। দশম অধ্যায়টি শ্রীপ্রতুলচন্দ্র গুপ্তর লেখা।